সিকিমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত বুদ্ধকথা

বনগাঁয় বজরং দলের অভ্যাসবর্গ

হুগলী জেলায় রামনবমী উপলক্ষ্যে মোটরবাইক মিছিল

বাঁকুড়ায় ওন্ডা প্রখণ্ডে জলছত্র

গুরজাঙ ঝরা চা বাগানে 'গীতা দান' কার্যক্রমে
প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী গৌতম সরকার

কল্যাণ বাণী **বস্তুতঃ অন্যদের ভালো জিনিসকে চিনতে পারা মানুষের সমস্ত গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত বিরল গুণ। একজন কার্যকর্তার যে নীতিটিকে ধ্রুবতারার মতো সামনে রেখে পথ চলতে হবে, তা হল অন্যের সদ্‌গুণরাজির বীজগুলিতে জল সিঞ্চন করা এবং তাদের সম্মুখে নিজের উত্তম আচরণের নীরব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে, সযত্নে তাদের দোষ ত্রুটির আগাছাগুলিকে সকলের সম্পূর্ণ অজান্তেই উপড়ে তুলে ফেলা।—পরম পূজনীয় গুরুজী।**

সম্পাদকীয়....

আট এবং নয়ের দশকেই মুসলমানেরা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশে পরিণত হইয়াছিল। উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানেরা চিরকালই সরকার পক্ষে থাকিতে চাহিয়াছে, সঙ্ঘবদ্ধরূপে ভোটদান করিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন দেখিতে চাহিয়াছে ও বিগত ৪১ বৎসর যাবৎ তাহাতে নিরবচ্ছিন্নরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছে। প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক দলগুলি সরকারে থাকিলে অনুপ্রবেশ, গোহত্যা, জাল নোট পাচার, নারীপাচার, শিশুশ্রম, অস্ত্র মজুদ ও অস্ত্র পাচার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতে কোনওপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। বরং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর নামে দুই টাকা কেজি চাল, মিড ডে মিলের আহার, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায়ের গুণোত্তর প্রগতিতে বংশবৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ রচনা করিয়া দেয়। প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠরোধ নির্বাসন ইত্যাদি করিয়া তাহারা মেরুদণ্ডহীন বশংবদ বুদ্ধিজীবীকে পালন করিয়া চলে। বাম আমলে সংখ্যালঘু তোষণ হইত অনুপ্রবেশকারীর ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড তৈয়ারি করিয়া দিয়া, জমিজমা জবরদখল করিতে দিয়া, অজস্র রাজনৈতিক হত্যা করিয়া। তৃণমূল আমলে তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে নানাবিধ বৃত্তি প্রদান, স্বল্প সুদে ঋণ, হজ হাউজ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসার অনুমোদন ইত্যাদি। ইহা ব্যতীত স্থানীয় হউক বা জাতীয়, যে কোনও হিংসাত্মক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম ভোটনির্ভর শাসক দল মুসলমানের পক্ষ লইতে বাধ্য থাকে। সম্প্রতি কালিয়াচক বা একবালপুরের ঘটনায় ইহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়াছে। কালিয়াচকে জাল নোটের কারবারিরা নিঃশঙ্কচিত্তে থানায় অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, দগ্ধ করিয়াছে সকল অপরাধের নথি। একবালপুরে হাসপাতাল ভাঙচুরের ঘটনায় দোষীদের শাস্তিবিধান না করিয়া মুখ্যমন্ত্রী অকস্মাৎ বেসরকারী চিকিৎসালয়ের বর্ধিত বিল লইয়া সক্রিয় হইয়া উঠিলেন। ইসলামীয় তাত্ত্বিকরা সর্বদাই হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি চরম বিদ্বিষ্ট ছিলেন। নিরুদ্বেগ মধ্যবিত্ত শ্রেণি সমাজকে শ্রেষ্ঠ মেধা উপহার দেয়। সেই মেধা হয় হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। অতএব নিরুদ্বেগ মধ্যবিত্তকে উদ্বেগে অস্থির করিবার নিমিত্ত একপ্রকার বন্ধ করা হইয়াছে ডি.এ., বিলম্বিত হইয়াছে বেতন কমিশন। যে ইসলামীয় সাম্য ও জেহাদের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গের ভূমি আন্দোলন ও তোলাবাজি সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

যে বাঙালি একদা সমগ্র বিশ্বে মেধা-বুদ্ধির জন্য সমাদৃত ছিল, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো তাহাকে বাংলাদেশের ন্যায় পাশ্চাত্যে ট্যাক্সিচালক অথবা আরব দুনিয়ায় শ্রমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করিতে হইবে। নানাবিধ মানদণ্ডে রাজ্যের অগ্রগতি লইয়া সরকার উত্তরোত্তর মিথ্যার আশ্রয় লইতেছেন। নানাবিধ ক্ষুদ্র দানদাক্ষিণ্য দ্বারা সরকার জনগণের চিত্ত জয় করিতে সচেষ্ট হইলেও তীব্র বেকার সমস্যা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দুর্বল পরিকাঠামো, আদালতগুলিতে নিষ্পত্তি না হওয়া বিরাট সংখ্যক মামলার বোঝা, রাজ্য সরকারের ঋণের বোঝার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি সামগ্রিকরূপে রাজ্যের এক হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির প্রতি অঙ্গুলীনির্দেশ করে। ব্যর্থতার বিরাট বোঝা মস্তকে লইয়া শাসক দল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে আরও দৃঢ়রূপে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। যে কোনও মূল্যে তাহাদের ধরিয়া রাখিতে কখনও নিষিদ্ধ করা হয় দুর্গাপূজার ভাসান, কখনও ধরপাকড় চলে রামনবমীর মিছিলে, বিদ্যালয় বন্ধ করিতে বলা হয় রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি পঠন-পাঠনের কারণে, সরস্বতী পূজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ধর্মীয় অনুভূতিহীন, দেশভক্তিহীন হিন্দু বাঙালির নিকট করজোড় আবেদন, স্বধর্ম-স্বদেশের প্রসঙ্গ তালাবন্ধ করিয়া তুলিয়া রাখিলেও নিতান্ত উন্নয়নের স্বার্থে তাঁহারা বর্জন করুন এই ঘোর সাম্প্রদায়িক মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতিকে। হৃদয়ে মরুধর্ম ধারণ করিয়া কলিকাতাকে লন্ডনে পরিণত করিবার স্বপ্ন দেখা বৃথা। ঈশ্বরভক্ত রাষ্ট্রভক্ত বঙ্গভাষীর নিকট আবেদন, সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকূপ হইতে বঙ্গভূমিকে নিষ্ক্রান্ত করিবার এই ঘোর সংগ্রামে কালক্ষেপ না করিয়া প্রবল উদ্যম ও ধৈর্যসহকারে অবতীর্ণ হউন। সময়ের সদ্ব্যবহার না করিলে গান্ধার, সিন্ধু, কাশ্মীর, পাঞ্জাবের ন্যায় বঙ্গের হিন্দুদিগেরও চরম বিপর্যয় আসিতে আর মাত্র কয়েক দশকের অপেক্ষা। ❑

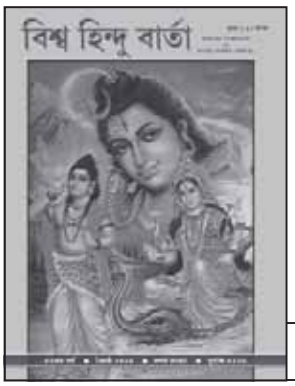

বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্
ওঁ
ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৪২তম বর্ষ * জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ * দশম সংখ্যা * যুগাব্দ ৫১১৯

সম্পাদকমণ্ডলী

মুখ্য উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন গিরি
সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ শ্রী পীতারুণ মুখোপাধ্যায়

৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Website : www.vhp.org / Bengali
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com
vishvahinduvarta@yahoo.in

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	৩
বাংলার হিন্দুশক্তি জাগছে	৫
পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবি গঙ্গে	৭
লোকমাতা গঙ্গা	১৩
বিশ্ব হিন্দু পরিষদ—কিছু কথা	১৭
বাংলার ধ্বংস হওয়া মন্দির	২১
জাগো হিন্দু জাগো	২৩
ষষ্ঠী ও জামাই ষষ্ঠী	২৬

পরিষদ বার্তা ২৮ রাজ্যবার্তা ২৯ রাষ্ট্রবার্তা ৩২
বিশ্ববার্তা ৩৪

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	আজীবন গ্রাহক চাঁদা	ডাক মাশুল
১০ টাকা	১১০ টাকা	১৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

'বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তা'-র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

যাঁহারা 'বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তা'-র গ্রাহক হতে চান সরাসরি বিশ্ব হিন্দু বার্ত্তার অফিসে বার্ষিক গ্রাহক অথবা আজীবন গ্রাহক চাঁদা 'মানি অর্ডার' অথবা 'চেক/ড্রাফট' মাধ্যমে পাঠিয়ে বার্ষিক গ্রাহক অথবা আজীবন গ্রাহক হতে পারেন। চেক/ড্রাফট পাঠালে **'VISHVA HINDU VARTA'** এই নামে নীচের ঠিকানায় পাঠাবেন।

VISHVA HINDU VARTA
33, Bhupen Bose Avenue
Kolkata-700004, West Bengal

যাঁরা অ্যাকাউন্ট টু অ্যাকাউন্ট টাকা ট্রান্সফার করে গ্রাহক হবেন তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে নিজেদের নাম, অ্যাকাউন্ট নং, কোন মাস থেকে গ্রাহক হতে চান তা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন।

Phone : 2555-4231/3588, Mobile : 8537954325

UBI Bank A/c. No. 1183010102690
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
Back Cover Page Rs. 20,000/-
Inside Front or Back Cover Page Rs. 10,000/-
Inside Full Page Rs. 6,000/- ● Half Page Rs. 3,000/-
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ
স্বরূপ চট্টোপাধ্যায়—৮৫৩৭৯৫৪৩২৫

● লেখকদের প্রতি
১। প্রতি ইংরেজি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। সাদা পৃষ্ঠায় মার্জিন ছেড়ে উল্টো পৃষ্ঠা খালি রেখে লিখবেন। **DTP** করে পাঠালেও চলবে।
৩। ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **Whatsapp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।

বাংলার হিন্দুশক্তি জাগছে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন—তিনি সাচ্চা হিন্দু। এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার ছ'বছর বাদে, তিনি উপলব্ধি করেছেন—তিনি যে সাচ্চা হিন্দু এ কথাটি এবার ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করাই ভালো। এতাবৎকাল পর্যন্ত কোনো হিন্দুকে স্বঘোষিত সাচ্চা হিন্দুর সার্টিফিকেট বুকে ঝুলিয়ে ঘুরতে হয়েছে—এমন দেখা যায়নি। এই মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এক সময় 'সততার প্রতীক' কাট আউট ঝুলিয়ে নিজের প্রচারে নেমেছিলেন। সারদা-রোজভ্যালি-নারদ কেলেঙ্কারির পর অবশ্য 'সততার প্রতীক' কাট আউটটি আর ঝোলাতে দেখা যায় না। সততাকেও পণ্য করে যিনি নিজেকে ভোটের বাজারে বিকিয়ে দিতে চান—তিনি আদৌ সততার প্রতীক কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সারদা-রোজভ্যালি এবং নারদ কেলেঙ্কারির পর রঙ-মাটি গলে গিয়ে 'সততার প্রতীকের' খড়ের কাঠামোটি বেরিয়ে পড়েছে। তেমনি, সভা-সমিতিতে যাকে গলা ফাটিয়ে ঘোষণা করতে হয়— 'আমিই সাচ্চা হিন্দু'— তাঁর হিন্দুত্ব কতটা সাচ্চা সে প্রশ্নও থেকে যাবে। মনে রাখবেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে সাচ্চা হিন্দু ঘোষণা করার জন্য ক্ষমতায় আসার পর ছ'টি বছর সময় নিয়েছেন। মাঝের এই ছ'বছর 'সাচ্চা হিন্দু' মুখ্যমন্ত্রী হিজাব পরিহিতা হয়ে সভায় সভায় ঘুরেছেন। হোর্ডিং-এ হোর্ডিং-এ তাঁর হিজাব পরিহিতা ছবিতে শহর ছেয়ে গিয়েছে। 'সাচ্চা হিন্দু' মুখ্যমন্ত্রী গরিব হিন্দু পুরোহিতদের জন্য কোনো ভাতা চালু করার আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু ইমাম ভাতা চালু করার উৎসাহ দেখিয়েছেন। 'সাচ্চা হিন্দু' মুখ্যমন্ত্রী মুসলমানদের মহরম পালনের কারণ দেখিয়ে হিন্দুর দুর্গা ভাসানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অবশেষে বিগত রাম নবমীর দিন যখন বাংলার হিন্দু সমাজ সগর্বে নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে—তখন মাথার হিজাব খুলে রেখে মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' ঘোষণা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তার ভাই বেরাদররাও প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তাঁরা আদতে 'সাচ্চা হিন্দু'। মুখ্যমন্ত্রীর এক ভাই বীরভূমের কঙ্কালীতলার সতীপীঠে মণ মণ কাঠ পুড়িয়ে যজ্ঞ করছেন, তো, আর এক ভাই মহাবীরের পদতলে মাথা ঠুকে 'আমি হিন্দু, আমি হিন্দু' বলে কান্নাকাটি জুড়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে—এতদিন পরে নিজেকে 'সাচ্চা হিন্দু' বলে ঘোষণা করলেও, হিন্দু আবেগ কি নতুন করে জয় করতে পারবেন মুখ্যমন্ত্রী? ব্যাপারটা বোধকরি এত সহজ নয়। ক্ষমতায় আসা ইস্তক বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের প্রতি কোনোরকম সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং এই বাংলায় যারা প্রতিনিয়ত হিন্দুদের ওপর হামলা চালাচ্ছেন, হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে দু'বেলা গাল পাড়ছে যারা— তাদের প্রতিই মুখ্যমন্ত্রী দরাজ হস্ত, হয়েছেন। গত ছ'বছর ধরে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন এই স্বঘোষিত সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী। তসলিমা নাসরিনকে এই পশ্চিমবাংলা থেকে বিতাড়নের যিনি অন্যতম পাণ্ডা, তিন-তালাকের সমর্থনে যিনি মোল্লা মৌলবীদের পাশে বসে অহরহ গলা ফাটাচ্ছেন—সেই মৌলবাদী ইসলামি নেতাটিকে এই মুখ্যমন্ত্রীই সংসদে পাঠিয়েছেন। নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের এক প্রাক্তন নেতা, যিনি ক্যানিংয়ে হিন্দুদের ওপর হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—তাঁকেও সংসদে পাঠিয়েছিলেন এই মুখ্যমন্ত্রী। দেগঙ্গায় হিন্দুদের ওপর হামলা যার নির্দেশে হয়েছিল, সেই কুখ্যাত ব্যক্তিটিও এখন মুখ্যমন্ত্রীর ছত্রছায়ায় তাঁর দলে রয়েছেন। এই মুখ্যমন্ত্রীর আমলেই উলুবেড়িয়ার তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়ে নবি দিবস পালনের দাবিতে একমাস জোরজবরদস্তি করে বিদ্যালয় বন্ধ করে রেখেছিল ইসলামিক মৌলবাদীরা। এই বিদ্যালয়েই হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের সরস্বতী পূজা করতে দেওয়া হয়নি। এই সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকারের শিক্ষাদপ্তর বাংলা পাঠ্য বইয়ের আরবীকরণ করেছেন। এই সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর শাসনের ছ'বছরের ভিতরই কালিয়াচক, ধূলাগড়ের মতো ঘটনা ঘটেছে। মজার কথা হচ্ছে, যিনি নিজেকে আজ সাচ্চা হিন্দু বলে ঘোষণা করছেন—তিনি তাঁর রাজত্বে হিন্দুদের ওপর ঘটে যাওয়া এতগুলি অন্যায়ের ঘটনার কোনোরকম প্রতিকার করেননি। বরং, এইসব অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন যেসব হিন্দু সন্তানেরা, মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়ে তাদের হেনস্থা করেছে।

আসলে, এই বাংলায় হিন্দুরাও যে একদিন সংগঠিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব সগর্বে জানান দিতে পারে—সে ধারণাই এই মুখ্যমন্ত্রীর ছিল না। আর পাঁচজন রাজনৈতিক নেতার

মতো তিনিও ধারণা করে নিয়েছিলেন—হিন্দুরা কখনো সংগঠিত হতে পারবে না—অতএব তাদের অনুভূতি, তাদের ধর্মবোধকে মূল্য দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্যে সোৎসাহে গোমাংস ভক্ষণ করেও যদি কেউ হিন্দুর ধর্মবোধে, হিন্দুর ভাবাবেগে আঘাত করে—তাহলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার কোনো প্রয়োজন নেই—এমনটিই ভেবেছেন এই মুখ্যমন্ত্রী। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো অপরাধ নেই। স্বাধীনতা পরবর্তী সত্তর বছর, বাংলার হিন্দু সমাজকে কাপুরুষ বানিয়ে রাখার একটি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে নিয়েছে বামপন্থীরা। বাংলার হিন্দু সমাজের কানের কাছে পাখি পড়ার মতো সেকুলারিজমের মন্ত্র আউরে তাকে হিন্দু পরম্পরা, হিন্দু দর্শন, হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু ধর্মের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু বাংলার হিন্দু যে কোনোদিনই কাপুরুষ ছিল না—সেই ইতিহাস গত সত্তর বছর একবারও স্মরণ করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি। বাংলার হিন্দুর ইতিহাস বীরত্বের ইতিহাস। যশোহরের প্রতাপাদিত্য থেকে শুরু করে অগ্নিযুগের অরবিন্দ, বাঘাযতীন, সূর্য সেনের ভিতর দিয়ে সে ইতিহাস প্রবাহিত। এই ইতিহাস হিন্দু জাতীয়তাবাদের ইতিহাস। এই ইতিহাসই জন্ম দিয়েছে বন্দেমাতরম মন্ত্রের।

তার পূর্বসূরীদের মতো এই সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীও ভেবে নিয়েছিলেন বাংলার হিন্দু আসলে কাপুরুষ। অতএব তাকে অবহেলা করাই চলে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে অবহেলা ও অপমান করে তিনি তাই হাত ধরেছেন সেই ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির যারা মুসলিমদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবি তুলে একদা এই দেশকে ভাগ করেছিল, সেই শক্তির হাত ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী যারা এই মুক্তচিন্তার পশ্চিমবঙ্গে, শ্যামাপ্রসাদের পশ্চিমবঙ্গে শরিয়তী শাসন চালু করতে চাইছে, হাত ধরেছেন সেই শক্তির যারা শরীরে ভারতীয় কিন্তু মনে পাকিস্তানি। মুখ্যমন্ত্রী ভেবেছেন, এই অশুভ ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠীর হাত ধরে, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাথায় চাঁটি মেরে নিরাপদে তার রাজ্যপাট চালিয়ে যেতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই মনোভাবে উৎসাহী হয়েছেন এ রাজ্যের মৌলবাদী ইসলামিক জাতিও। ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি ঘোষণা করেছেন, আমরা ২৮ শতাংশ। আমরাই ঠিক করব এ রাজ্যে কারা সরকার গড়বে। টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বরকতি তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন—মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তারাই মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছেন। সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রীর জমানায় এই ইমামটির স্পর্দ্ধা এত বেড়েছে যে, তিনি খোদ প্রধানমন্ত্রীর নামেও ফতোয়া জারি করতে দ্বিধা করছেন না।

কিন্তু ২৮ শতাংশের সমর্থনে ক্ষমতায় থেকে যাওয়ার মুখ্যমন্ত্রীর এই দিবাস্বপ্নটি এবার খান খান হয়ে যেতে বসেছে। দিবাস্বপ্নটি চুরমার করে দিয়েছেন এই বাংলার হিন্দুরাই। গত সত্তর বছর ধরে বঞ্চিত, অপমানিত এবং আক্রান্ত হতে হতে এই বাংলার হিন্দুরা অনুভব করেছে স্বামী প্রণবানন্দের সেই অমোঘ বাণীটি। স্বামী প্রণবানন্দ বলেছিলেন—'সম্প্রীতি কখনও সবলে দুর্বলে হয় না। সম্প্রীতি হয় সবলে-সবলে। হিন্দু যদি সবল হয়, তবে সম্প্রীতি আপসে হবে'। স্বামী প্রণবানন্দ বলেছিলেন, 'হিন্দু! তুমি বিদ্যা বুদ্ধি অর্থ সামর্থ্য—সব কিছুতেই শ্রেষ্ঠ হইয়াও কোন দুষ্ট দুর্বৃত্তের অত্যাচার নিবারণে সাহসী হইতেছ না? এমনি ভাবে অসহায়ের মতো নিচেষ্ট থাকিয়া কেন তুমি লাঞ্ছিত নিপীড়িত হইতেছ?' স্বামী প্রণবানন্দের এই মর্মবাণী আজ হিন্দুর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়েছেন। বিগত রাম নবমীর সমাবেশে বাংলার হিন্দু প্রমাণ করেছে—তারা নিবীর্য, অসহায় জাতি নয়। বরং লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নির্যাতিত হতে হতে বাংলায় হিন্দু যে সংগঠিত হতে চাইছে—রাম জন্মভূমি সেই ইঙ্গিতই দিয়েছে।

হিন্দুর এই উত্থানের ভিতরই অশনি সংকেত দেখছেন সাচ্চা হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী। অশনি সংকেত দেখছে বামপন্থী এবং নেহরুপন্থী সেকুলাররাও। হিন্দুকে কাপুরুষ সাজিয়ে রেখে যে ঘৃণ্য খেলাটি তারা এতদিন খেলছিলেন—সেই খেলাটি এবার বন্ধ হতে চলেছে বুঝেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন তারা। আতঙ্কিত হয়েই প্রশ্ন হিন্দুর হাতে অস্ত্র কেন? হিন্দু যে বরাবরই শস্ত্র পূজন করে এসেছে; শস্ত্রপূজন যে হিন্দু ধর্মাচরণের একটি বড় অঙ্গ—সেটিই বিস্মৃত হয়েছেন এই মহাপণ্ডিতেরা। অবশ্য ইতিহাস এখন তার কালের ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। হিন্দুর জাগরণকে আর বোধহয় রোখা সম্ভব হবে না।

বাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীকে আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করতেই হবে। উপলব্ধি করতে হবে—সংগঠিত হিন্দু শক্তিই পারে বাংলার হিন্দুকে রক্ষা করতে। গত সত্তর বছরে বাংলার হিন্দু সংগঠিত হতে পারেনি। তাই সে বারবার আক্রান্ত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, অপমানিত হয়েছে। আজ যখন সে সংগঠিত হচ্ছে, তখন ত্রাহি রব পড়ে গিয়েছে 'সাচ্চা হিন্দু' সাজতে চাওয়া রাজনীতিকদের মধ্যে। কিন্তু এখন 'সাচ্চা হিন্দু' সাজতে চেয়ে আর কী লাভ হবে? বাংলার হিন্দুরা বুঝে গিয়েছে—কে প্রকৃত আর কে সাচ্চা হিন্দু। একবার যখন সংগঠিত হতে পারছে হিন্দুরা—তখন ২৮ শতাংশ নয়, ৭২ শতাংশ হিন্দু ঠিক করবে পশ্চিমবঙ্গের শাসনে ক্ষমতা কার হাতে যাবে। আর সেইদিনই বাংলার হিন্দু তার প্রকৃত মর্যাদা খুঁজে পাবে বাংলার মাটিতে। ❑

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবি গঙ্গে

স্বামী বেদানন্দ

ভারতের মহান ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎসভূমি হলেন পর্বতরাজ হিমালয় এবং নদীমাতা গঙ্গা। দেশের সর্বত্র জনগণের মধ্যে তাই অবতার, মহাপুরুষ, সাধক-সাধিকা, বেদ, গীতা, উপনিষদ, ভাগবতের সঙ্গে সমভাবে গঙ্গার নাম উচ্চারিত হয়। ভারতাত্মার প্রতীক হলেন গঙ্গা। অগণিত মানুষজন—ধনী-দরিদ্র-জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে অন্তরে গভীর গঙ্গাভক্তির ভাব পোষণ করেন। তাই গঙ্গা কোনও সাধারণ নদীর নাম নয়। গঙ্গা একটি পবিত্রতম জীবন প্রবাহ। যে প্রবাহের প্রতিটি জলকণা জৈবস্তর অতিক্রম করে দৈবস্তরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যে প্রবাহের প্রত্যেকটি বিন্দু সত্য-তপস্যা-ত্যাগ-স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতার শুভগুণে অনুরণিত। এমন যে পবিত্রতম প্রবাহ গঙ্গা নদী—সেই তিনিই ঈশ্বরী—পরমা জননী—মাতৃস্বরূপা মহাপ্রকৃতি—ভগবতী। আবার পতিতোদ্ধারিণী মা হলেন অসংখ্য দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের কাছে গভীর জাতীয়তাবাদের প্রতীক। তিনি এখানে দেশ জননী। মিশরের নাইল, চিনের হোয়াং হো, রাশিয়ার ভল্‌গা ও জার্মানির রাইন নদীর মতো ভারতের গঙ্গা নদী হল দেশের জাতীয় জীবনের প্রাণপ্রবাহ। বিশ্বের দরবারে ভারতীয়দের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য তথা জাতি, ধর্ম, অধ্যাত্ম ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক হল পবিত্রতমা জাহ্নবীর এই মুক্তধারা।

মা গঙ্গার অপূর্ব গৌরবগাথা ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যে নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। বিশেষ করে নানা পৌরাণিক কাহিনিগুলিতে গঙ্গার মাহাত্ম্যবর্ণনা রয়েছে। তবে গঙ্গা ঠিক কবে মর্ত্যধামে অবতরণ করেছিলেন—তার সঠিক সময়ের হিসাব পাওয়া যায় না। কোনও পুরাণের মতে বৈশাখী শুক্লাতৃতীয়া (অক্ষয় তৃতীয়া) তিথিতে গঙ্গা ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়েছে। ব্রহ্মপুরাণের মতে, জ্যৈষ্ঠ শুক্লাদশমীতে (দশহারার দিনে) গঙ্গাবতরণ ঘটেছে। এ নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। তবে এ দুটি দিনেই ভারতের লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গায় স্নান করেন, তর্পণ করেন। শাস্ত্রে আছে গঙ্গাতীরে শ্রাদ্ধ কিংবা শিব পূজা করলে জীবন ধন্য হয়ে যায়। গঙ্গাতীরে মৃত্যু প্রত্যেক হিন্দুরই কাম্য। এতে আত্মার সদ্‌গতি লাভ হয়। মহাভারতে লেখা আছে, গঙ্গা যে সব পাহাড়ের পাদদেশ, গ্রাম ও নগরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সে সব স্থান অতি পবিত্র। গঙ্গার দুই তীরই তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসীর সমতুল্য। গঙ্গার পবিত্র প্রবাহ দর্শনে মানুষের অন্তরে শুভ সংস্কার বৃদ্ধি পায়। মনে ভগবান বিষয়ে চিন্তাভাবনা জন্মায়। গঙ্গাবারি সযত্নে ভক্তিভরে সিঞ্চন করলে মনের পাপ ধুয়ে যায়। মানুষের মৃত্যুর পর গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন দিলে জীবাত্মার অক্ষয় স্বর্গবাস লাভ হয়। গঙ্গাতীরে বসে দানধ্যান, জপ-তপ করলে মানুষের অশেষ পুণ্য সঞ্চার ঘটে। শাস্ত্রে আছে, গঙ্গাগর্ভ থেকে ২২৫ ফুট পর্যন্ত গঙ্গাতীর। আর গঙ্গাতীর থেকে চার মাইল পর্যন্ত ক্ষেত্র। এই চার মাইল ক্ষেত্রের বাতাস গঙ্গার পবিত্র স্পর্শে পূর্ণ থাকে। যাঁরা এই ক্ষেত্রে বাস করেন তাঁরা অত্যন্ত ভাগ্যবান।

ধর্মের পাশাপাশি বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতেও গঙ্গার পবিত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন আজকাল গঙ্গার জলে ব্যাপক দূষণ হলেও পূর্বে গঙ্গা জল ছিল শুদ্ধ। তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রোগের জীবাণুনাশক খনিজ পদার্থ থাকত। ফলে কলেরার সমতুল্য রোগের জীবাণু নাকি গঙ্গা জলে বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারত

না। গঙ্গা জল চর্মরোগের পক্ষেও উপকারী ছিল। কাজেই মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে মা গঙ্গার ছিল সমান নজর। তিনি যে কোন আদিকাল থেকে সন্তানদের কতভাবে শুদ্ধ করে আসছেন তা জানা সত্যিই কঠিন।

এই পুণ্যসলিলা গঙ্গার এমন বহুতর গৌরবগাথা চিন্তা করে মনে সহজেই বোধ জন্মায় যে, গঙ্গাই ছিল পৃথিবীর সমস্ত জলরাশির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে গঙ্গাসাগর ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। গঙ্গাই হিন্দুজাতির পবিত্র জীবনের প্রাণ-ভ্রমরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (বিভূতিযোগ, শ্লোক-৩১) এই ব্যাপারে সাক্ষী দিয়েছেন—তাঁর মতে 'পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্/ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবি।' অর্থাৎ বেগবানদের মধ্যে আমি বায়ু, শস্ত্রধারীদের মধ্যে আমি পরশুরাম, মৎস্যগণের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সকলের মধ্যে আমি গঙ্গা। পরমপুরুষ রামচন্দ্র, পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণ এবং গঙ্গা হলেন একই বস্তুর বিভিন্ন নাম ও রূপ। এ ব্যাপারে 'পুরাণে' একটি ছোট্ট কাহিনি আছে—তা হল, দেবর্ষি নারদ নানা রাগ-রাগিনীযুক্ত সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু একদা তিনি অমনোযোগী হয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকলে গানের তাল লয় সব ভঙ্গ হয়ে যায়। নারদ নিজের এসব দোষ-ত্রুটি বুঝতে না পেরেই নিজেকে বিরাট গায়ক বলে সর্বত্র গর্ব করতে থাকেন। এতে রাগরাগিনীরা মানসিকভাবে অত্যন্ত আঘাত পায়। তারা দেবর্ষির গর্ব খর্ব করার জন্য নিজেরাই যুক্তি করে পথে বিকলাঙ্গ নরনারীর আকারে পড়ে থাকে। নারদ বাইরে থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিজের ঘরের দরজার সামনেই এমন বিকলাঙ্গ মানুষজনদের দেখে চমকে ওঠেন। তারপর সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে নিজের সঙ্গীতজনিত অজ্ঞতা ও ত্রুটির কথা জানতে পারেন।

তখন উদ্বিগ্ন নারদ কী উপায়ে তাদের বিকলাঙ্গতা দূর হবে তা জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তারা নারদকে বলে যে, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব নিজে এসে সঙ্গীত শোনালে তারা আবার পূর্ণ দেহ ফিরে পাবে।

এই কথা শুনে নারদ সে স্থান ত্যাগ করে মহাদেবকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। মহাদেব বললেন, তাঁর সঙ্গীতের প্রধান দুই শ্রোতা ভগবান ব্রহ্মা ও অনিন্দসুন্দর বিষ্ণুকে উপস্থিত করাত না পারলে তিনি সঙ্গীত গাইবেন না। নারদ যে সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ এ কথাও তিনি আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন।

অবশেষে করজোড়ে প্রার্থনা করে নারদ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সঙ্গীত শোনার জন্য আপন আলয়ে নিয়ে এলেন। মহাদেবের কণ্ঠে অনন্তের ভাব মাধুর্যসম্পন্ন সুরলহরী শ্রবণ করে রাগরাগিনীরা সুস্থতা প্রাপ্ত হলেন। কিন্তু ভগবান ব্রহ্মা শিব দ্বারা গীত সঙ্গীতের প্রকৃত মর্ম অনুধাবন করতে ব্যর্থ হলেন। তাই তিনি আনমনা হয়ে বসেই রইলেন। তবে ভগবান বিষ্ণু এক মনে এমন সঙ্গীত শুনলেন যে, সঙ্গীতের অনন্ত সুরের রাজ্য থেকে তিনি আর ফিরতে পারলেন না। সেখানেই দ্রবীভূত হয়ে গেলেন। ব্রহ্মা তা দেখে সহসা চমকে উঠলেন। তিনি দ্রবীভূত বিষ্ণুকে নিজ কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন। এই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকেই গঙ্গা মর্ত্যে পরবর্তীকালে অবতরণ করেন। এ জন্য মহামুনি বাল্মীকি তাঁর 'গঙ্গাষ্টকম্' স্তোত্রে লিখেছেন—

'গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি মুরারি চরণ চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরঃচারি পাপহারি পুনাতু মাম।।'

অর্থাৎ হে গঙ্গা, তুমি বিষ্ণুর চরণ হতে নিঃসৃত, মহাদেবের মস্তক দিয়ে প্রবাহিত, (তুমি) অতি পাপসংহারক ও মনোহর, (তোমার) জল আমাকে নিয়ত পবিত্র করুক। প্রত্যহ শ্রদ্ধাভরে এই শ্লোকটি পাঠ করে জ্ঞানী পুরুষরা গঙ্গাজল পান করেন।

এছাড়া গীতা প্রশস্তিতে প্রাজ্ঞগন লিখেছেন—

'সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা সর্বদেবময়ো হরিঃ।
সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা সর্বদেবময়ো মনুঃ।।
গীতা গঙ্গা চ গায়ত্রী গোবিন্দেতি হৃদি স্থিতে।
চতুর্গকার সংযুক্তে, পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।।'

অর্থাৎ গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী, হরি (গোবিন্দ) সর্বদেবস্বরূপ, গঙ্গা সর্বতীর্থময়ী এবং গায়ত্রী মন্ত্র সর্বদেবময়। গ-কার সংযুক্ত গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দ—এই চারটি যাঁর হৃদয়ে অবস্থিত হয় তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। এইজন্য মহাপুরুষেরা বলেন যে, গঙ্গাকে স্মরণ করা, গঙ্গার নাম উচ্চারণ করা এবং গঙ্গাস্নান করার মতো পুণ্যকর্ম খুব কমই আছে। আর গঙ্গাতীরে বাস হল স্বর্গবাসেরই সামিল। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর 'গঙ্গাষ্টকম্' স্তোত্রের শ্লোকের মধ্যে আবার বলেছেন—'হে মা, তুমি পার্বতীর সপত্নী, পৃথিবীর বিলাসস্বরূপা ও স্বর্গারোহণের বিজয় পতাকা; হে ভাগীরথী,

তোমার নিকট এই প্রার্থনা—তোমার তীরে বাস, তোমার জল পান, তোমার তরঙ্গ নিরীক্ষণ এবং তোমার নাম স্মরণ করতে করতে তোমাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন আমার দেহাবসান হয়।'

বলাবাহুল্য প্রাচীনকালে অধিকাংশ হিন্দুর মনেই এই বাসনা প্রবল ছিল। তাই দেখা যায়, গঙ্গা জল বিনা কোনও দেবদেবীর পূজা সম্পন্ন হয় না। গঙ্গাকে স্পর্শ বিনা অন্তরে শুদ্ধ বোধ জাগে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও গঙ্গাকে কেবল জল বলে গণ্য করতেন না। তাঁর মতে, গঙ্গাজল হল 'ব্রহ্মবারি'। পরমেশ্বরের দ্রবীভূত অংশ। তাই দেখা যায়, তিনি সারা জীবন গঙ্গা জল শ্রদ্ধাভরে পান করেছেন। কোনও বিষয়ী লোক দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বহুক্ষণ বসে থাকলে তিনি স্থানটিতে গঙ্গা জল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নিতেন। একবার একজন খারাপ চরিত্রের মেয়ে (ভগবতীদাসী) তাঁকে প্রণাম করলে তিনি আঁতকে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে নেন। মদ্যপ গিরিশ ঘোষ দক্ষিণেশ্বরে যখন তখন এলে তিনি তাঁকে গঙ্গা-স্নান করতে পাঠাতেন। ঠাকুরের মতো শ্রীশ্রীমায়েরও গঙ্গাতে স্নান করার নিত্য অভ্যাস ছিল। গঙ্গা ছিল শ্রীমায়ের ধ্যানের বস্তু। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার পর পবিত্র গঙ্গাকে নিয়ে তাঁর মনে এক সুন্দর দিব্যদর্শন উপস্থিত হয়। তিনি একদিন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ যেন সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে গঙ্গার জলে নামছেন—গঙ্গাস্নান করবার জন্য। কিন্তু তিনি দেখে অবাক হলেন যে, ঠাকুর যতই গঙ্গার জলের ভিতর প্রবেশ করছেন ততই যেন তাঁর শরীরটি গঙ্গার পবিত্র জলে দ্রবীভূত হয়ে তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে। যখন তাঁর সম্পূর্ণ শরীর গঙ্গার জলের সঙ্গে মিশে গেল—তখন কোথা থেকে নরেন্দ্রনাথ এসে সেই পবিত্র গঙ্গার জল দু'হাতে নিয়ে চারিদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছেন এবং অসংখ্য লোকের উপর সেই জল ছিটোতে ছিটোতে উচ্চৈঃস্বরে 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণতনু দ্রবীভূত গঙ্গাবারির এই কাহিনি স্বর্গলোকের ভগবান বিষ্ণুর কথাই পুনরায় মনে করিয়ে দেয়। গঙ্গা জলের মহিমা প্রকাশ করতে গিয়ে শ্রীমা আবার বললেন—'কেউ কেউ আছে, যারা আমার পা-টি স্পর্শ করলেই শরীরটি স্নিগ্ধ শীতল হয়ে যায়। আবার অনেকে আছে, যাদের স্পর্শমাত্রই সর্বাঙ্গ জ্বালা করে। যেন বোলতার কামড় বলে আমার কাছে মনে হয়। তারপর গঙ্গা জল দিয়ে ধুলে আমি কিছুটা স্বস্তি পাই।' এখানে গঙ্গা জল সাক্ষাৎভাবে মায়ের শ্রীঅঙ্গ থেকে পাপস্পর্শ দূরীভূত করে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অবশ্য পতিতোদ্ধারিণী মা গঙ্গা ও মানবের শোক-তাপনাশিনী মা সারদাদেবীর মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। একটি ঘটনা এ ব্যাপারে উল্লেখ করলে চিন্তাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ঘটনাটি হল—শ্রীমায়ের চিরসঙ্গিনী যোগীন মা একবার মায়ের অত্যধিক সংসারে আসক্ত মন নিয়ে চিন্তা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন আমাদের ঠাকুর ছিলেন কত ত্যাগের পরাকাষ্ঠা, তপস্বী—আর মাকে দেখছি ঘোর বিষয়ী, ভাই, ভাইপো ও ভাইঝিদের নিয়ে সদা ব্যস্ত। এরকম সন্দেহের পীড়ায় হতাশ মানসিক অবস্থা নিয়ে তিনি গঙ্গার ধারে বসে ধ্যান করার চেষ্টা করছিলেন। এমন সময় গঙ্গার উপর দিয়ে এক মৃত শিশুর পচা-গলা দেহ ভেসে যাচ্ছিল। ঠাকুর সহসা তাঁর সম্মুখে উপনীত হয়ে ওই বস্তুটির দিকে আঙুল নির্দেশ করে যোগীন মাকে বললেন—'এই গঙ্গার পবিত্র জলকে কি কিছু কখনও অপবিত্র করতে পারে? এর জল কি কখনও অপবিত্র হয়? এঁকেও (শ্রীমা সারদাকে) এই একইভাবে দেখবে ও জানবে। তাঁর সম্পর্কে আর কখনও কোনও সন্দেহ কোরো না।' ভারতের প্রায় সকল মহাপুরুষ যথা ত্রৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, অরবিন্দ, আনন্দময়ী মা প্রমুখ প্রত্যেকেই গঙ্গাকে ভক্তিভাবে দর্শন করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক-কালে গীতা, গঙ্গাবারি ও ঈশানুসরণ বইটি সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেন। শ্রীশ্রীমাকে বাগবাজারের বাড়িতে প্রণাম করতে গেলে স্বামীজি রীতিমতো গঙ্গা জল পান করে শুদ্ধ হয়ে তবে যেতেন। তাছাড়া, গঙ্গা স্নান ছিল তাঁর মহা পুণ্যকর্ম। তিনি সাক্ষাৎ শিব ছিলেন কিনা— তাই তাঁর অন্তরে গঙ্গার প্রতি প্রেম চিরবিদ্যমান ছিল।

আমাদের দেশের সকল মহাপুরুষই গঙ্গাকে প্রাণের জিনিস বলে ভাবতেন। তবে মা গঙ্গার প্রতি ভক্তিতে সকলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন আচার্য শঙ্কর। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের লেখা 'গঙ্গাস্তোত্রম্' যেমন মধুর, তেমনই ভুবনবিখ্যাত। এই স্তোত্রের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—'নরকনিবারিণী জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে।' যার সহজ অর্থ হল—নরকনিবারিণী, কলুষবিনাশিনী, স্বমহিমায় অতি যশস্বিনী জাহ্নবী গঙ্গা

তোমার কৃপা পেয়ে কেহ যদি তোমার স্রোতে একবার স্নান করে তবে সে পুনর্বার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে না। ত্রিভুবনতারিণী গঙ্গার এমন প্রশস্তি করেও আচার্যের মনে শান্তি হয়নি। তিনি গঙ্গাকে আরও শ্রদ্ধার ভাবে স্তুতি করে লিখলেন—'বরমিহনীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ'। অর্থাৎ তোমার এই জলে বরং কচ্ছপ বা মৎস্য, কিংবা এই তীরে ক্ষুদ্র টিকটিকি অথবা দুই ক্রোশ মধ্যে দীন কুকুরভোজী হয়ে থাকাও ভাল, তবু তোমা হতে দূরে নৃপতি শ্রেষ্ঠ হওয়াও ভাল নয়। এই মহাপুরুষ তাঁর কাশীবাসের জীবনে নিত্য গঙ্গা স্নান করতে যেতেন।

গঙ্গা হল পতিতপাবনী। মানুষের অন্তরে লোভ-মোহ-হিংসা-দ্বেষ-ঘৃণা জন্মালে সেইসব মানুষ মানবতা থেকে, দেবতার স্তর থেকে পতিত হন। আসুরিক মনোভাবাপন্ন হয় তাদের জীবন। তখন সেইসব মানুষেরা সমাজের বুকে তাপিত, ঘৃণিত, চোর, চরিত্রহীন, খুনি, ধর্ষক রূপে হন নিন্দিত, সমালোচিত। কেউ কেউ কুকর্মে শাস্তি পায়। অধিকাংশই ধরা পড়ে না। সেইসব মানসিকভাবে অসুস্থ পতিত মানুষ, যারা নানাভাবে নানাভাবে কুকর্মে, চুরিতে, ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে জীবনকে নরকে পতিত করেছে—এমন সব অগণিত পতিত সন্তানের পাপমোচন করতে সহায়তা করেন মা জাহ্নবী। তাই শাস্ত্রে বারে বারে শ্রদ্ধাভরে গঙ্গা স্নানের মাধ্যমে পাপ মোচনের কথা বলা হয়েছে।

ভারতের ধর্ম তথা সংস্কৃতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একদা ভারতীয়দের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, আশা-ভরসা, ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ সবই গঙ্গা নদীকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তাই হাজার হাজার মাইল জুড়ে গঙ্গার পুণ্য প্রবাহের তীরে তীরে গড়ে উঠেছে শত শত হিন্দু মন্দির, দেবালয়, পবিত্র স্নানের জন্য বাঁধানো গঙ্গার ঘাট, পরকালের স্বর্গযাত্রার জন্য গঙ্গা তীরবর্তী পবিত্র শ্মশান—চুল্লি। সবই গঙ্গার তটে স্তরে স্তরে যেন সাজানো। তাছাড়া এই গঙ্গার পবিত্র তট ঘিরে যুগে যুগে রচিত হয়েছে কত রাজরাজাদের উত্থান-পতনের কাহিনি, কত প্রজাদের নিত্য দিনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, ব্যথা-বেদনার মর্মস্পর্শী জীবনের জলচ্ছবি। আবার দস্যুদের ত্রাস, রক্তলোলুপতা, বিভীষিকা গঙ্গার তটদেশে বনভূমিকে করেছে যুগে যুগে উৎকণ্ঠিত। গঙ্গা তীরের শ্মশান ভূমিতে শোনা গেছে সহমরণের তীব্র আর্তনাদ। এত উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও আজও মা গঙ্গা কুলকুল ধ্বনি তুলে সাগরসঙ্গমে চলেছেন। তাঁর পবিত্র তীরের ভূমিতে পাঁচশো বছর পূর্বে নদের নিমাই হরিনামে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছেন। তাঁরই পবিত্র তটে বসে কলির ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'মা' 'মা' বলে ভবতারিণীর সঙ্গে কত লীলাখেলা করেছেন। এছাড়াও গঙ্গার তীরে বসে কত কত মহাপুরুষ কতভাবে ঈশ্বরচিন্তা করে জীবনকে পূর্ণতায় ভরেছেন তার কোনও খোঁজ নেই।

এসবের সাক্ষী রেখে মা গঙ্গা আজও সদা প্রবাহমানা। তাঁর কোনও বিশ্রাম নেই, ঘুম নেই, বিরক্তি নেই, বিতৃষ্ণা নেই। আকাশের প্রজ্জ্বলিত সূর্যের তাপ বুকে নিয়ে মা চলেছেন, বাতাসের মৃদু হিল্লোল স্পর্শ নিয়ে মা চলেছেন, রামধনুর অপরূপ শোভা দেখতে দেখতে মা চলেছেন, মাঝিমাল্লার ভাটিয়ালী গান শুনতে শুনতে মা আবার—প্রেমময়ী গঙ্গা—মা আমার চলেছেন সাগরসঙ্গমে। যুগে যুগে মায়ের পবিত্র স্রোতে ভেসে চলে সন্তানের শেষ যাত্রার কত জীর্ণ পোশাক, কত অবাঞ্ছিত ফুলের মালা, আশা-কামনা ভরা ছোট ছোট কত প্রদীপের শিখা। মা মমতাময়ী সন্তানের মনের সমস্ত কষ্টকে হরণ করে 'দুঃখহারিণী' নামে হয়েছেন বন্দিতা। পূজিতা। কত শত নরনারী মাকে নিত্য ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, ফল নিবেদন করে মনে মনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তার ইয়ত্তা নেই। সন্তান-সন্ততির প্রেমভরা আরতিতে মাতা অন্তরে হন আহ্লাদিতা। চিরপ্রাণবন্তা মা যেন নিত্য নবীনা। আলুথালু বেশে জাহ্নবী তার মুক্তধারায় সদা সাগরে প্রবহমানা। আর তাঁর অপরূপ প্রবাহের শোভাদর্শন করতে করতে যুগে যুগে কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত ঋষি, কত যোগী, কত বৈরাগী, কত উদাসী, কত ছন্নছাড়া ঘর ছেড়েছে। ঠাঁই নিয়েছে মায়ের চির স্নেহের আঁচলে—মায়ের স্বরূপকে জানার দুর্নিবার প্রত্যাশায়—তার কোনও ইয়ত্তা নেই। তাই এই পুণ্যপ্রবাহের প্রতিটি কণায় লেখা আছে অগণিত মানব-মানবীর ত্যাগ-তপস্যার মর্মগাথা। এ যেন অপূর্ব স্বর্গীয় সঙ্গীতের করুণায় বিগলিত বিশাল এক মাতৃহৃদয়।

আমাদের মানস অনুভূতিতে মা গঙ্গা হলেন চিরজাগ্রতা এক দেবী। তিনি যেন অপূর্ব সুন্দরী এক বেগবতী রমণী। তপস্বিনী ভৈরবী। উন্মাদিনী চিত্ত। বিষ্ণু অঙ্গে চির সোহাগিনী। যাঁর গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। ভ্রূ-যুগল অসম্ভব মোহময়ী। মমতা মাখানো অপূর্ব দুটি টানা চোখ।

গোলাপের পাপড়ির মতো লাল ঠোঁট। কপালে লাল সিঁদুরের টকটকে টিপ। পিঠ বেয়ে নেমে এসেছে সুবাসিত কালো চুলের অপরূপ গুচ্ছ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। মুখে অপরূপ বিজয়িনীর হাসি। দেবী সুরেশ্বরী জননী স্বর্গলোকে আপনভাবে বিরাজিতা। স্বর্গের প্রিয়জনদের নিয়ে তাঁর স্নেহ-প্রেম-মায়া-মমতার মায়াবী সম্পর্কের অন্তরঙ্গ সংসার। স্মৃতি, আশা, সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা ভরা নিত্যদিনের সে সংসারের পথ চলা। বেশ ভালই কাটছিল স্বর্গের অপরূপ অপ্সরাদের সাহচর্যে তাঁর জীবন—যিনি বিষ্ণুর স্ত্রীরূপেই ছিলেন গৌরবান্বিতা। কিন্তু সগর বংশীয় রাজা ভগীরথ মাকে স্বর্গে থাকতে দিলেন না। তপস্যা বলে মাকে মর্ত্যে আহ্বান করে বসলেন। যে কাহিনিও বড় বিচিত্র —এখন তাই-ই বলি—

প্রাচীনকালে অযোধ্যায় সগর নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি হলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। সগর কথার অর্থ হল—স (সহিত), গর (বিষ)—বিষের সহিত জাত বলে এঁর নাম সগর। রাজা সগরের দুই পত্নী ছিলেন। জ্যেষ্ঠা বিদর্ভ রাজকন্যা কেশিনী এবং কনিষ্ঠা অরিষ্ঠনেমীর কন্যা সুমতি। রাজা বীরবিক্রমে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ প্রভৃতি শত্রুদের যুদ্ধে বিনাশ করেন। কিন্তু বহুদিন গত হলেও তাঁর কোনও সন্তান লাভ হল না। এমতাবস্থায় তিনি দুই স্ত্রীকে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে মহাদেবের তপস্যায় ব্রতী হলেন। মহাদেব তাঁদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দেন যে, এক স্ত্রীর বংশধর এক পুত্র হবে এবং অন্য স্ত্রীর হবে কীর্তিমান ষাট হাজার পুত্র। কেশিনী অসমঞ্জ নামে এক পুত্রের জন্ম দেন। অপরদিকে সুমতি একটি তুম্বাকার পিণ্ড প্রসব করেন। কালে তা হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ষাট হাজার পুত্রের জন্ম হয়।

পুত্রেরা সকলে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বংশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য সগর রাজা বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেন। সগরের যজ্ঞ ও তপস্যা দেখে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের অধিপতির পদ হারাবার ভয়ে খুব ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য অশ্বটিকে চুরি করে পাতালের ভেতর কপিল মুনির আশ্রমে বেঁধে রেখে এলেন। এদিকে সগরের ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞাশ্ব খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁরা কপিল মুনির আশ্রমে অশ্বটিকে বাঁধা অবস্থায় দেখে চমকে উঠলেন। আর ভাবলেন, কপিলমুনিই ছলে বলে ঘোড়াটিকে চুরি করে এনে এখানে রেখে দিয়েছেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সগর পুত্ররা মহর্ষি কপিলমুনিকে অপমান করে বসলেন। ঋষির দীর্ঘ ধ্যান ভঙ্গ হল। কুপিত মুনিবর ক্রুদ্ধ নেত্রে সগরতনয়দের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ভস্ম হয়ে গেলেন।

রাজা সগর দেবর্ষি নারদের কাছ থেকে সব সংবাদ শুনলেন। এরপর শোকাকুল রাজা পৌত্র অংশুমানকে কপিলমুনির কাছে পুত্রদের সংবাদ জানতে পাঠালেন। অংশুমান মুনির আশ্রমে ভস্মস্তূপ ও অশ্বের সন্ধান পেলেন এবং বিরক্ত মুনিবরকে তুষ্ট করার জন্য স্তব করতে শুরু করলেন। অংশুমানের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে মুনি তাঁকে দুটি বর দিতে চাইলেন। প্রথমে তিনি যজ্ঞাশ্ব এবং দ্বিতীয় বরে সগর কুমারদের মুক্তি প্রার্থনা করলেন।

কপিলমুনি অচিরেই প্রথম বরটি মঞ্জুর করলেন। তাঁকে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বরের ক্ষেত্রে মুনিবর অংশুমানকে বললেন, যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে যজ্ঞ সম্পন্ন কর। তোমার পিতৃগণের পরিত্রাণের সময়ের এখনও বহু দেরি আছে। তোমার পৌত্রই তাদের উদ্ধার করবে। সে মহা তপস্যাবলে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে সুরধুনী গঙ্গাকে স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসবে। সেই পতিতপাবনী গঙ্গার পুণ্যস্পর্শে মুক্তি পাবে তোমার পূর্বপুরুষরা। তারপর তারা সকলেই হাসিমুখে বৈকুণ্ঠে গমন করবে।

যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে নিয়ে এলেন অংশুমান। তারপর সগর রাজার সাথে সমস্ত আলোচনা করে যজ্ঞের কাজ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞ শেষে সগর অংশুমানের হাতে শাসনপাট তুলে দিয়ে বনবাসী হলেন।

অংশুমান রাজকার্য পরিচালনার সাথে সাথেই শিবের তপস্যা শুরু করলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল তপস্যা করেও তিনি শিবকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না। রাজার দেহরক্ষার পর তাঁর পুত্র দিলীপ রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তিনিও বহুকাল তপস্যা করে মর্ত্যে গঙ্গাকে আনয়ন করতে ব্যর্থ হলেন।

দিলীপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ভগীরথ হলেন বংশের রাজা। তিনি লোকের কাছে তাঁর পূর্বপুরুষদের সমস্ত ব্যাপার শুনে তাঁদের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হলেন। ফলে অচিরেই মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যের সমস্ত কর্মভার তুলে দিয়ে হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় বসলেন। প্রথমে জল খেয়ে, তারপর পাতা খেয়ে ও অবশেষে প্রায় অনাহারে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু বছর তপস্যার পর পরিশেষে সৃষ্টিকর্তা

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি সমস্ত বিবরণ শুনে গঙ্গাকে মর্ত্যে আনয়নের জন্য তাঁকে অনুমতি দিলেন।

কিন্তু স্বর্গ থেকে গঙ্গার অবতরণ কালে কে তাঁকে ধারণ করবেন? এই প্রশ্ন ভগীরথে হৃদয়কে তোলপাড় করে তুলল। এমন প্রশ্নের সমাধান নিয়ে ভগীরথ তাই মহাদেবের দ্বারস্থ হলেন। তিনি প্রাণপণ তপস্যা করে শিবকে সন্তুষ্ট করে তুললেন। তপস্যায় তুষ্ট শিব তাঁকে বললেন—বেশ তো, তুমি হৈমবতীকে মর্ত্যে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে নিজ জটার মধ্যে ধারণ করব।

এরপর ব্রহ্মার আদেশে গঙ্গা ভীষণ বেগে শিবের মস্তকে পতিত হয়ে ধ্বংসকর্তাকেই যেন সাগরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। স্বর্গ থেকে সুরধুনীর এমন শুভ আগমনে আনন্দে নেচে উঠল ভগীরথে মন। তিনি আগে আগে শঙ্খধ্বনি করতে করতে গঙ্গাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন, আর পতিতপাবনী গঙ্গা তাঁর উচ্ছল তরঙ্গ নিয়ে ছুটে আসছেন ভগীরথের পিছনে পিছনে। অবশেষে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গঙ্গা এলেন জহ্নু মুনির আশ্রমে। মুনি তখন ধ্যানস্থ হয়ে যজ্ঞের পাশে বসে ছিলেন। হঠাৎ গঙ্গার জলে মুনিবরের সমস্ত উপকরণাদি ভেসে গেলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গাকে পান করে ফেললেন। এমন অবস্থায় ভগীরথ আবার পড়লেন বিপদে। তিনি ফের কঠিন তপস্যা করে জহ্নুমুনিকে সন্তুষ্ট করে গঙ্গাকে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর মুনিবর করুণাবশত তাঁর কর্ণদ্বার দিয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করলেন। সেই থেকেই গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যা জাহ্নবী নামে পরিচিত হলেন।

জহ্নুমুনির কাছে ছাড়া পেয়ে গঙ্গা সহজ সরল গতিতে ভগীরথকে অনুসরণ করতে করতে সমুদ্রে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে পতিত হলেন। গঙ্গার পুণ্যসলিলে ভেসে গেল পূর্বপুরুষদের ভস্মরাশির স্থান। প্লাবিত হয়ে গেল কপিলমুনির সমস্ত আশ্রম। পবিত্র জাহ্নবীর অনুপম স্পর্শে সগর সন্তানরা মুক্তি পেয়ে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করলেন। মকর সংক্রান্তির পুণ্য প্রভাতেই গঙ্গা সাগরে প্রবেশ করে বলে অগণিত পুণ্যার্থী এখনও মুক্তি লাভের আশায় সেদিন সাগরসঙ্গমে ভক্তিভরে স্নান, তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন।

গঙ্গী নদী হয়ে মর্ত্যে নেমে আসার কারণ প্রসঙ্গে আর একটি পুরাণ আছে, এটি হল—সতীনদের পরস্পর কলহের অভিশাপের ফল। 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' মতে—গঙ্গার জন্ম বিষ্ণুর দেহ থেকে হয়। স্থিতিকর্তা ভালবাসাবশত তাঁকেই বিবাহ করে নেন। ফলে গঙ্গা হয়ে যান বিষ্ণুর স্ত্রী। কিন্তু ইতোমধ্যেই বিষ্ণুর দুই স্ত্রী ছিল—তাঁরা হলেন লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। গঙ্গার অত্যন্ত শুদ্ধ স্বভাবের জন্য বিষ্ণু অতিমাত্রায় তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এতে ঐশ্বর্যশালী লক্ষ্মী স্বামীকে ক্ষমা করলেও সরস্বতী তা সহ্য করতে সক্ষম হননি। এর ফলে উভয়ের মধ্যে প্রবল মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। কলহ বাড়তেই থাকে। একদিন বিরোধের চরম পর্যায়ে সরস্বতী গঙ্গাকে মর্ত্যের নদীরূপে পরিণত হওয়ার শাপ দিয়ে দেন। ব্যথিত গঙ্গাও সরস্বতীকে অনুরূপ শাপে ভ্রষ্ট করেন। এর ফলে মর্ত্যে গঙ্গা ও সরস্বতী নামে দুটি পবিত্র নদীর সৃষ্টি হয়।

গঙ্গার উৎপত্তি নিয়ে নানা পুরাণে নানা মতের ফলে পণ্ডিতদের মধ্যে বিভ্রান্তের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবন্ধ বড় হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় সেসব দেখানো থেকে বিরত থাকতেই হল। তবে বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবে ভোগবাদী সংস্কৃতির প্রচারের ফলে দেশের অধ্যাত্ম ভাবধারার প্রতি লোকের মনে বিশ্বাস অনেক কমে গেছে। এর ফলে সাধারণ জনের অন্তরে অত্যধিক অর্থলিপ্সা, লোভ, লালসা, কামনা-বাসনা, স্বার্থপরতা, হিংসা, আত্মকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণতিতে মানুষের মন থেকে সম্প্রীতি, শান্তি ও পরপর শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনেকটা হারিয়ে গেছে। সুষ্ঠু সংস্কৃতিবিহীন মানুষ পরস্পরের কাছে হয়ে উঠেছে প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু ও যন্ত্রণার সূচাগ্র শলাকাচলেছন বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজজীবন থেকে মানুষের মনকে শুভপথে পরিচালনা করার জন্য পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার সাথে ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। তবে মানুষের জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটবে। মানুষের জীবনে এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য গঙ্গাভক্তির ভূমিকা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বললে ভুল হবে না। ভারতের সকল মহাপুরুষের জীবনই এইসব ঘটনার সাক্ষী বহন করে চলেছে। তাই আসুন আমাদের অন্তরে সত্য, পবিত্র ও প্রেমপূর্ণ ভাবকে সদাজাগ্রত করে রাখার জন্য গঙ্গাভক্তির মাধ্যমে মাকে দূষণমুক্ত করার পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করি। পরিশেষে মা গঙ্গার চরণে জানাই আমাদের সকলের ভক্তিবিনম্র প্রণাম—

'ওঁ সদাপাতক সংহন্ত্রী সদ্যো দুঃখবিনাশিনী
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গৈব পরমাগতি।' ❑

লোকমাতা গঙ্গা

মহামণ্ডলেশ্বর পরমহংস পরমাত্মানন্দ

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী।।
(গীতা, ১০/৩১)

আমি পাবনকারীদের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারীদের মধ্যে রাম, মৎস্যদের মধ্যে আমি মকর এবং নদী সমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী।

গঙ্গা দ্রবীভূত বিষ্ণু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথি মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্রে গঙ্গা স্বর্গ থেকে মর্তলোকে আসেন। সেইজন্য এইদিন অত্যন্ত পবিত্র। এই পুণ্য তিথি মানুষের পাপক্ষয়কারী। এই তিথিতে সংকল্প পূর্বক গঙ্গায় স্নান এবং শাস্ত্রানুমোদিত যোগ্য পাত্রে দান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই তিথিতে গঙ্গা স্নানকারী-ভক্তের দশবিধ ও দশজন্মার্জিত পাপ হরণ করেন বলে এর নাম দশহরা। শাস্ত্র দশবিধ পাপ সম্পর্কে বলছেন—

অদত্তানামুপাদানম্ হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্।।
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব বৈশুণ্যঞ্চাপি সর্বশঃ।
অসম্বন্ধ প্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্।।
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্ট চিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্মমানসম্।।
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবী।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে।।
বিষ্ণু পাদার্ঘসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি।।
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুণীহি মাম্।।

গঙ্গার তিনরূপ—স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্তে ভাগীরথী, পাতালে ভোগবতী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বিষ্ণুর তিন পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। সরস্বতী ও গঙ্গা একদিন সপত্নী কলহকালে পরস্পরকে নদী হতে অভিশাপ দেয়। সরস্বতী বলেন—'তুমি মর্তে যাও, পাপীর পাপভোগী হও।' 'ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিভাগং লভিষ্যসি।' তখন ভগবান কৃষ্ণ গঙ্গাকে বলেন—

গঙ্গে যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় দেহিনাম্।।
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুদুষ্করাৎ।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে।।
মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্চরী।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬/৪৯-৫১)

—হে গঙ্গে, বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়িকা তুমি সরস্বতীর পশ্চাৎ অংশরূপে পৃথিবীতে যাবে, পাপীগণের পাপদগ্ধ করার নিমিত্ত এবং ভারতীর শাপে ভারতে গমন করবে। ভগীরথের দুষ্কর তপস্যায় নীত হয়ে পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে পবিত্র নদী হবে এবং হে সুরেশ্বরি, আমার অংশভূত রাজা শান্তনুরও পত্নী হবে।

এই একই বিবরণ দেবীভাগবতের নবম অধ্যায়ে বিদ্যমান। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গার মর্তাবতরণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্য গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে মর্তে অবতরণ করেন। শিব তাঁকে জটায় ধারণ করলেন, তারপর শিবজটা থেকে গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণ হলেন। কিন্তু গঙ্গার উদ্ভব হয়েছিল বিষ্ণুর পদনির্গত জল থেকে। ব্রহ্মা গঙ্গাকে রেখেছিলেন কমণ্ডলুতে ধরে। পরে তিনি ভগীরথের অত্যাশ্চর্য তপস্যায় প্রীত হয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন কমণ্ডলু থেকে। বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুপদাঙ্গুষ্ঠ বিনির্গত জলই গঙ্গা—

বামপাদাম্বুজাঙ্গুষ্ঠ নখস্রোতো বিনির্গতা।
বিষ্ণোর্বিভর্তি যাং ভক্ত্যা শিরসাহর্নিশং ধ্রুবঃ।।
(বিষ্ণুপুরাণ—২/৮/১০৫)

—বিষ্ণুর বামপদাঙ্গুষ্ঠ নখ থেকে স্রোতরূপে নির্গতা গঙ্গাকে ধ্রুব ভক্তিদ্বারা দিবারাত্র মস্তকে ধারণ করেন।

এখানে ধ্রুব গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ভাগবত অনুসারে শিব বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ

করেছিলেন—

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ।।
(ভাগ ঃ ৯/৯/৯)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে কৃষ্ণপ্রেমাভিলাষিণী গঙ্গার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত হওয়ায় শ্রীরাধা গণ্ডুষে গঙ্গাপান করতে উদ্যতা হলে গঙ্গা কৃষ্ণপদে প্রবেশ করেন।

পানং কর্তুং সমারেভে গণ্ডুষাৎ সিদ্ধযোগিনী।
গঙ্গারহস্যং বিজ্ঞায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে বিবেশ শরণং যযৌ।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—১১/৮১-৮২)

গঙ্গা অন্তর্হিতা হওয়ায় জগৎ জলশূন্য হয়ে পড়ে। দেবগণ স্তবস্তুতির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করলে শ্রীকৃষ্ণ পদনখ থেকে গঙ্গাকে নির্গত করলেন। সেইজন্যই গঙ্গা হলেন বিষ্ণুপদী।

তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
নির্গতা বিষ্ণুপাদাব্জাৎ তেন বিষ্ণুপদী স্মৃতা।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—১১/১৪০)

অতঃপর ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন—

ইত্যেবমুক্ত্বা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ।
গন্ধর্বেণ বিবাহেন তাং জগ্রাহ হরিঃ স্বয়ম্।।
(ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—১২-১৮)

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও গঙ্গার বিষ্ণুপদ থেকে উৎপত্তি-কথা স্বীকৃত হয়েছে—

ধ্রুবাধারং জগদ্‌যোনেঃ পদং নারায়ণস্য যৎ।
ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।।
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭/১)

জগদুৎপত্তির যে স্থির আধার নারায়ণের পদ, সেখান থেকে ত্রিপথগামিনী গঙ্গা নির্গতা হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা গেলেন চন্দ্রে, চন্দ্র থেকে সূর্যকিরণের সঙ্গে তিনি মেরুপৃষ্ঠে পতিত হলেন। সেখান থেকে দ্বিবিধ পথ অতিক্রম কর তিনি হিমালয়ে উপনীতা হন। হিমালয়ে শিব ধারণ করলেন গঙ্গাকে, আবার ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে বৃষধ্বজ শিব গঙ্গাকে মুক্তি দিলে গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে চললেন—

তান্ প্লাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্।
দধার তত্র তাং শম্ভুর্ন মুমোচ বৃষধবজঃ।।
ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভুঃ।
তত্র মুক্তা চ শর্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্।।
প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্লাবয়ন্তী মহানদী।।
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৫৭।১০-১১)

—দক্ষিণদিকস্থ পর্বতসকলকে প্লাবিত করে পর্বতরাজ হিমগিরি গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন। সেখানে বৃষধ্বজ শম্ভু তাঁকে ধারণ করলেন, আর ছাড়লেন না। ভগীরথ উপবাস ও স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে আরাধনা করলেন, তখন মহাদেবের দ্বারা মুক্ত হয়ে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, এই মহানদী ত্রিধারায় পূর্বদেশ প্লাবিত করলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণে গঙ্গা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে সমুদ্রে পতিত হয়েছে। মেরুশৃঙ্গে যে চতুর্ধারার সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে একটি ধারা বিখ্যাত সীতা নামে। তৃতীয় ধারা অলকানন্দা নামে পরিচিত। তারপরে গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পূর্বদিকে প্রবাহিতা তিনধারা।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে শিব-জায়া দক্ষ-সুতা সতী জন্মান্তরে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে হিমবান্ ও মেনার দুই কন্যা গঙ্গা ও উমারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবগণ গঙ্গাকে হিমবানের কাছ থেকে প্রার্থনা করে স্বর্গে নিয়ে এলে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং শিবের আকুলতায় চতুর্ভুজা মূর্তিতে শিবের কাছে এবং সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বিরাজ করতে স্বীকৃতি জানালেন। (বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড—১৩-১৪ অধ্যায়) তারপর এক সময়ে নারদের ও শিবের গান শুনে বিষ্ণু হলেন দ্রবীভূত—বৈকুণ্ঠ হল সলিলময়। এই সলিল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পেল, গঙ্গার সঙ্গে দ্রবীভূত বিষ্ণুর সম্মিলন হওয়ায় গঙ্গা পুণ্যতোয়া।

মহাভারতে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় আকাশ থেকে শিবের মস্তকে পতিত হলেন এবং মুক্তামালার মতো শোভা পেতে লাগলেন—

ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সুতা।।
তাং দধার হরো রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্।
ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব।।
শিবের মস্তকে গঙ্গার অবস্থানহেতু গঙ্গা শিবের

পত্নীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন। গঙ্গাগর্ভে শিববীর্য নিক্ষেপের ফলে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল, সেইজন্যও গঙ্গা শিবজায়া। গঙ্গা সতীর অংশরূপে হিমবান কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করায় শিবকর্তৃক পত্নীরূপে পরিগৃহীতা হয়েছিলেন, —এ কাহিনী বৃহদ্ধর্মপুরাণের। ভারতচন্দ্রের অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাকে সপত্নী বলে উল্লেখ করেছেন—

গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি।।

সৌরপুরাণেও গঙ্গাকে হিমবান ও মেনার কন্যারূপে অভিহিত করা হয়েছে—

মেনাহিমবতঃ সুতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ।
গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বে লোকমাতরঃ।।

—মেনা ও হিমবানের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ। তারপর গৌরী ও গঙ্গা দুই কন্যা লোকমাতা।

বামনপুরাণে (৫১ অধ্যায়) মেনকার তিন কন্যা—রাগিণী, কুটিলা ও কালী। শিবতেজ ধারণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় ব্রহ্মার শাপে কুটিলা হল নদী। এই কুটিলা নদীই শিবতেজ অগ্নির কাছ থেকে ধারণ করে শরবনে নিক্ষেপ করেছিলেন। অতএব কুটিলা গঙ্গারই নামান্তর।

বাল্মীকি-রামায়ণে গঙ্গা হিমবানের কন্যা মেনার গর্ভজাতা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া।
তস্যাং গঙ্গেয়মভবজ্জ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সুতা।।

কালিকাপুরাণেও গঙ্গা শৈলরাজকন্যা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—কার্তিকেয়জননী।

এই বিবরণে গঙ্গা কখনও কৃষ্ণ-পত্নী, কখনও শিব-পত্নী। কখনও তিনি হিমালয়ের কন্যা, কখনও বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ও ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে মর্তে অবতীর্ণা।

গঙ্গা দুটি। একটি স্বর্গে স্বর্গগঙ্গা, অপরটি পৃথিবীতে ভাগীরথী। স্বর্গগঙ্গা ছায়াপথ। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি সন্ধ্যার পর পূর্ব-আকাশে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু থেকে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত এক দুগ্ধবর্ণ বলয়ার্ধ উঠতে দেখা যায়। এটি বিষ্ণুগঙ্গা। অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে উদিত হয়, এটি শিবগঙ্গা। এই বলয়ার্ধের উত্তর সীমার একটু দূরে ধ্রুব মৎস্য নক্ষত্র। এর চারদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এইজন্য গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভবা।

আকাশগঙ্গা জন্মেছে বিষ্ণুসূর্যের পদ থেকে। শিবের গানে বিষ্ণু দ্রবীভূত হয়ে বৈকুণ্ঠলোক প্লাবিত করলেন। দ্রবীভূত বিষ্ণু সূর্যের সর্বব্যাপী রশ্মি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম ও অভিন্ন। সেইজন্য বিষ্ণু পাদোদ্ভবা গঙ্গার অবতরণের জন্য শিব এবং ব্রহ্মার সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছিল। 'সূর্যরূপধরো হরি'র যে সর্বব্যাপ্ত কিরণ তাই তো দিব্য 'মমৈব বা পরামূর্তি স্তোয়রূপা শিবাত্মিকা। ব্রহ্মাণ্ডাণামনেকানামাধারঃ প্রকৃতিঃ পরা'। (স্কন্দপুরাণ, কাশী, পূর্বার্ধ-২৭।৭)—গঙ্গা আমারই শিবরূপিণী জলময়ী মূর্তি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গা বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার।

স্কন্দপুরাণেই গঙ্গাস্তবে বলা হয়েছে—

নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ।
নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোহস্তুতে।।
নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাঙ্কর্যৈ তে নমো নমঃ।।

এখানেও গঙ্গা শিবরূপিণী, বিষ্ণুরূপিণী ও ব্রহ্মরূপিণী। এখানে আরও বলা হয়েছে গঙ্গা ও গৌরী অভিন্না—গঙ্গাপূজা ও গৌরীপূজার বিধি একই—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্‌গৌর্য্যাস্তু পূজনে।
যো বিধির্বিহিতঃ সম্যক্ সোহপি গঙ্গা প্রপূজনে।।

মহাদেব বলছেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব যেমন অভিন্ন তেমনি গঙ্গা ও গৌরী অভিন্না—

যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণো যথা ত্বন্তু তথা হ্যমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুর্রূপং ন ভিদ্যতে।।
বিষ্ণুরুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা।
গঙ্গাগৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রতে মূঢ়ধীস্তু সঃ।।

(স্কন্দপুরাণ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—৭।১৫৭-৫৮)

ত্রয়ীদেবতার শক্তিরূপা বলেই গঙ্গা ত্রিপথগা। এই ত্রিপথগা গঙ্গা নদীগঙ্গা নয়—আকাশগঙ্গা। আকাশগঙ্গা বিষ্ণুর দ্রবীভূত কায়ারূপে রাত্রিকালে বদ্ধ থাকেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, রবির উদয় হলে ব্রহ্মার কমণ্ডলুর উৎসমুখ থেকে তিনি হন সর্বব্যাপ্ত, তারপর শিবশক্তি হিসাবে শিবের জটাজালে ভর করে নেমে আসেন মর্তে কল্যাণের মূর্তিরূপে। হিমালয় কন্যা গঙ্গা সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন, দ্রবীভূত বিষ্ণুও প্রবেশ করলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। দুয়ের মিলন হল ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে। তারপর বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সলিল এবং হিমালয়শিখরস্থিত তুষারসম্ভবা সলিল মিলিত হয়ে মর্তে অবতীর্ণ হলেন

পুণ্যতোয়া গঙ্গারূপে।

গঙ্গার জল সর্বপাপহারীরূপে গণ্য হওয়ায় গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে মৃত্যু, মৃত্যুকালে গঙ্গাজল পান, গঙ্গাতীরবর্তী শ্মশানে শব সৎকার, গঙ্গাজলে দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য ও মুক্তির উপায়রূপে পরিগণিত হয়েছে। স্কন্দপুরাণে গঙ্গা কলিযুগের একমাত্র তীর্থ—কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্। (স্কন্দপুরাণ, কাশীঃ, পূর্বার্ধ—২৭।১৭) রামায়ণে জাহ্নবী সরিৎশ্রেষ্ঠা—জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্মুনিসেবিতাম্। (রামায়ণ, আদি-৩৫।৬) সগর রাজার পুত্রগণের দেহাবশেষ ভস্ম গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করায় সগর পুত্রগণের অনন্তকাল স্বর্গবাস হয়েছিল।

সাগরস্য জলং লোকে যাবৎ স্থাস্যতি পার্থিব।
সগরস্যাত্মজাঃ সর্বে দিবি স্থাস্যন্তি দেববৎ।।

গঙ্গাতীরবর্তী তির্যকপ্রাণী হওয়াও জল—কিন্তু গঙ্গা থেকে দূরে সার্বভৌম নরপতি হওয়াও কাম্য নয়—

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কারতবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য হি বাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ।।
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথ গব্যুতৌ শ্বপচো দীনো ন পুনর্দূরে নৃপতিকুলীনঃ।।

ভারতীয় বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুণ্যতোয়া সর্বতীর্থময়ী গঙ্গার স্রোতোধারা একাত্মতা লাভ করায় নদী-গঙ্গা দেবীগঙ্গা রূপে পূজিতা হয়েছেন এবং গঙ্গাদেবীর মূর্তিও পরিকল্পিত হয়েছে। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ক্রিয়াযোগসারে গঙ্গার মূর্তির বিবরণ আছে—

দদর্শপুরতো গঙ্গাং দ্বিভুজাং মকরাসনাম্।
কুন্দেন্দু শঙ্খধবলাং সর্বাভরণভূষিতাম্।।
রত্নকুম্ভসিতাম্ভোজ সংস্থিতামভয়প্রদাম্।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামালাবিভূষিতাম্।।
সুরূপাং সুদতীঞ্চৈব চন্দ্রাযুতশশিপ্রভাম্।
চামরৈবীর্জ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্।।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্র নিজান্তরাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।।

—সম্মুখে গঙ্গাকে দেখলেন, তিনি দ্বিভূজা, মকর-বাহনা, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের মতো শুভ্রবর্ণা, সকল অলংকার শোভিতা, রত্নকুম্ভ, শ্বেতপদ্ম ও অভয়মুদ্রাধারিণী, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মুক্তাহার বিভূষিতা, সুরূপা, সুন্দর দন্তযুক্তা, অযুত চন্দ্রের প্রভাসমন্বিতা, চামরের দ্বারা ব্যজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুপ্রসন্না, সুবদনা, করুণার্দ্র-হৃদয়া, ত্রিলোকপূজিতা, দেবপ্রভৃতির দ্বারা স্তুতা।

অগ্নিপুরাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে জাহ্নবী প্রতিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কুম্ভাব্জহস্তা শ্বেতাভা মকরোপরি জাহ্নবী।'

তন্ত্রশাস্ত্রে গঙ্গার ধ্যানমন্ত্রে গঙ্গাদেবীর যে বিবরণ আছে তাও পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ ঃ

শুদ্ধস্ফটিকসংকাশাং শুক্লাম্বরভূষিতাম্।
শুক্লমুক্তাবলীমালাং হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্।
শ্বেতমালাধরাং দেবীং শ্বেতাভরণভূষিতাম্।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিসেবিতাম্।।

—বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশবর্ণা, শুক্লবসনপরিহিতা, বক্ষোপরি শুভ্রমুক্তামালাশোভিতা, শ্বেতমালাধারিণী, শ্বেত অলংকার ভূষিতা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেবিতা।

সমুদ্রগুপ্তের (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) ব্যাঘ্রহন্তা রাজার ছাপ আঁকা সুবর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে এবং কুমারগুপ্তের (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) খড়্গহস্তা রাজমূর্তিলাঞ্ছিত সুবর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে মকরের উপরের দণ্ডায়মানা দীর্ঘমৃণালবিশিষ্টা পদ্মহস্তা গঙ্গার মূর্তি অংকিত আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় গুপ্ত রাজাদের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে) গঙ্গার মূর্তি পূজিত হোত।

যে গঙ্গা পাপনাশিনী, পবিত্রতাস্বরূপিণী; আমাদের মতো শ্রদ্ধা-বিশ্বাসহীন মানুষদের যথেচ্ছ ব্যবহারের কবলে পড়ে সেই গঙ্গাই কলুষবতী হয়ে উঠেছেন। সনাতন ধর্মীদের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ মানবিন্দুটি আজ দূষণক্লিষ্ট। অবিরল অমৃত-প্রবাহ দিকে দিকে জলাধার নির্মাণের প্রকোপে পড়ে ক্রমশঃ শীর্ণতোয়া হয়ে পড়েছে। যে পবিত্র জলধারায় যে কোনও রকম পবিত্র কর্ম সম্পাদিত হয়, সেই গঙ্গায় মানুষ এবং জীবজন্তুর মল-মূত্র, আধুনিক সভ্যতার সবরকম বর্জ্য প্রবহমান। এই নিদারুন অপমান থেকে মাকে বাঁচাতে না পারলে সন্তান হিসাবে জগতের কাছে আমাদের মুখ দেখানো উচিত নয়। মা গো শক্তি দাও। যেন তোমার প্রবাহ অবিরল এবং নির্মল করতে পারি।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।।

❑

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ—কিছু কথা

ড. প্রকাশ চন্দ্র চক্রবর্তী

পশ্চিমবঙ্গের অনেক মানুষ এখনও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্বন্ধে যথার্থভাবে অবহিত নন। সাধারণের সাধারণ অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে এই বিষয়ের অবতারণা।

ভারতবর্ষ প্রায় ৮০০ বৎসরের অধিককাল (ইং ১৭৫৭ পর্যন্ত) শক, হুণ (মতান্তরে হূণ), পাঠান, মোঘল প্রভৃতি-এর অধীনে ছিল। এরা এক হাতে অস্ত্র এবং অন্য হাতে তাদের ধর্ম এবং সংস্কৃতি নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করতো, সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো, অমানবিক এবং নিষ্ঠুরতম অত্যাচার করতো, ধর্মান্তরিত করতো, মেয়েদের সম্মান নষ্ট করতো, হত্যা করতো ইত্যাদি। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণে বলা হয়েছে—'যারা তাদের ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মানে না, তারা কাফের, সুতরাং করুণাপরবশে তাদেরকে হত্যা করো এবং বিনিময়ে বেহেস্তবাসী হও, যেখানে সুন্দরী ভোগ্যা নারী এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুরাজি পাবে।' সুতরাং ভারতবর্ষে তখন হত্যালীলা চলা খুবই স্বাভাবিক। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদের জন্মের পর একটা সময় থেকে আরবীয় মুসলমানদের ভারতবর্ষে আগমন এবং ইসলামী উন্মাদ অনুগামীদের অত্যাচার ভারতবর্ষের শান্তিকে বহুলাংশে বিঘ্নিত করে। ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি আক্রান্ত হয়। এ বিষয়ে হিসাবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দিচ্ছি।

(১) ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খিলজি বহুবিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে। সেখানে সমস্ত আবাসিক ছাত্রদেরকে অবলীলাক্রমে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়, দুষ্প্রাপ্য এবং অমূল্য গ্রন্থাদি নষ্ট করা হয়।

(২) ফিরোজ শাহ তুঘলক এবং তার অনুগামীরা প্রায় ৬ লক্ষ পুরুষ হিন্দুকে হত্যা করে। নারী, বৃদ্ধ, শিশু—কেউই তাদের নিষ্ঠুরতম অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। তারপর তারা স্বর্ণাদি অলংকার লুণ্ঠন করে, মন্দির ধ্বংস করে। এইসব ইসলাম ধর্মাবলম্বী মোঘল-পাঠানদের অত্যাচারে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত শান্তিপ্রিয় অনেক মানুষ 'খালসা' হতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিখ গুরু তেগবাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিং-কে আমরা সবাই তাঁদের অত্যুৎকৃষ্ট অবদানের জন্য গভীরভাবে স্মরণ করি।

(৩) বিশেষভাবে একাদশ শতকে মুসলমানেরা তরবারি হাতে ভারতবর্ষে ত্রাস এবং বিভীষিকার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এদের অন্যতম প্রধান মাহ্মুদ গজনী। তিনি ভারত আক্রমণ করেন, চারদিকে অগ্নিসংযোগ হত্যা, ব্যভিচার, লুণ্ঠন ইত্যাদি চালিয়ে যান। তিনি সর্বসমেত ১৭ বার ভারতভূমি আক্রমণ করেন, মন্দির ধ্বংস, মস্জিদ নির্মাণ, ধর্মান্তকরণ, হত্যাযজ্ঞ, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে বন্দী করা সহ বিপুল পরিমাণ ধনরত্নাদি ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠনও করেন। সোমনাথসহ অনেক বিখ্যাত মন্দির ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমির গায়ে মসজিদ নির্মাণ, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানব্যাপী মসজিদ, শ্রীরামজন্মভূমিতে বাবরি ধাঁচা ইত্যাদি মুসলমান শাসকদের কীর্তিসমূহ আমাদের কাছে অসহনীয় ব্যথা। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দুগণ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আর্থিক ইত্যাদি নানাভাবে অত্যাচারিত হন।

(৪) এরপর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌল্লার পতন এবং খ্রীষ্টান ইংরাজদের ভারতবর্ষে আগমনের সাথে সাথে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রচার এবং প্রসার চলতে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা নামক সামাজিক ব্যাধি, দারিদ্র ইত্যাদির সুযোগ নেয় খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ। নানাস্থানে গড়ে ওঠে বিপুল সংখ্যায় গীর্জা, অবাধে চলে ধর্মান্তরণ; এস্থলে রাজশক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

(৫) হিন্দুধর্মের আর একটি মহাশত্রু কমিউনিজম্। মার্ক্স বলেছেন ঃ 'ধর্ম হচ্ছে আফিং। এর পরিণাম হল শক্তিহীনতা, সুতরাং সর্বতোভাবে পরিহার্য।' সুতরাং, ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রসার জঘন্যতম অপরাধ। পরমারাধ্য পিতামাতা-ও কমিউনিস্ট না হলে তাঁরাও সন্তানের দ্বারা ব্রাত্য হওয়া উচিৎ।

সুতরাং হিন্দুদের সমূহ বিপদ। এমনকী প্রায় ১০০০ বছর পর ১৯৪৭-এর ভারতের খণ্ডিত স্বাধীনতার পরও হিন্দুদের অস্তিত্বের ওপর নানাভাবে আঘাত এসেছে। পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৭-এর ১৪ই আগষ্ট। খণ্ডিত ভারতবর্ষ ভারত/

ভারতবর্ষ/India হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট। কাশ্মীর সমস্যা এখনও চলছে। ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কাশ্মীর ভূ-স্বর্গ থেকে পণ্ডিতরূপে বিশেষভাবে পরিচিত হিন্দু নরনারীর ওপর অকথ্য আচরণ ও নিষ্ঠুর বিতারণ এক কলঙ্কময় ইতিহাস। নানা রাজ্যে মুসলিম তোষণ, গো-মাতা হত্যা সমানে চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বড্ড বেশি। এই সমস্ত রাজ্যে নানা বিষয়ে সমানাধিকারকে তুচ্ছজ্ঞান করে মুসলমানদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। নেতৃবৃন্দ ঔদার্যের মুখোশ পরে হিন্দুদের অস্তিত্বের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছেন। হিন্দুগণ সত্যিকার অর্থেই আজ বিপন্ন।

এ তো গেল ভূ-খণ্ডের কথা, মুসলিম-খ্রীষ্টান-কমিউনিস্ট এবং অন্যান্যদের অবাধ আক্রমণ-আগ্রাসনের কথা। এবার আক্রান্তদের কথা বলি।

এই হিন্দু আক্রান্তরা কে বা কারা? এ প্রসঙ্গে বলি—আরবীয়গণ সিন্ধুনদের পরপারের অধিবাসীগণকে 'সিন্ধু' বলতো। 'স'-এর আরবীয় উচ্চারণ ছিল 'হ', তাই 'সিন্ধু'-এর স্থলে 'হিন্দু' উচ্চারণ করতো। এখনও পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশের নোয়াখালি অঞ্চলের লোকেরা 'স'-কে 'হ' উচ্চারণ করেন। সুতরাং উচ্চারণ পার্থক্যের বিচার গ্রহণীয়। আবার, গ্রীসের উচ্চারণ 'হিন্দু'-এর স্থলে 'ইন্দু', অর্থাৎ, Indu এবং পরিবর্তিত আকারে বাসস্থানের নাম Indus—India. এ বিচারকেও উপেক্ষা করা যায় না। দেখুন না, পশ্চিমবঙ্গের কত নাম ঃ বঙ্গ, বাংলা, বঙ্গাল, Bengal, West Bengal। আবার কলিকাতা, কোলকাতা, কলকাতা, Calcutta, Kolkata; ঢাকা, Dacca, Dhaka ইত্যাদি। সুতরাং, এরূপ 'সিন্ধু'-'হিন্দু', Indu, Indus, India বানানোর এবং উচ্চারণের ভিন্নতা অবিশ্বাস্য নয়। আর, সিন্ধুনদের তীর থেকে শুরু করে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত সেই ভূমিখণ্ডের অধিবাসীদেরকে সঙ্গত কারণেই হিন্দু বলা হতো এবং তাঁদের ধর্ম, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি 'হিন্দু' হিসেবেই পরিগণিত হতো। যেমন, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু আচার, হিন্দু সংস্কৃতি ইত্যাদি। আসলে সেই অর্থে 'হিন্দু' যেমন অধিবাসীগণকে বুঝায়, তেমনই এটি একটি বিশেষ জীবনধারাকেও বুঝিয়ে থাকে।

উপাসনার পদ্ধতি আলাদা হতেই পারে। কেউ শাক্ত, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শৈব, কেউ অগ্নি উপাসক, কেউ সূর্য উপাসক ইত্যাদি। কিন্তু উপরোক্ত সবাই হিন্দু। পরবর্তীকালে ধর্মপ্রচারকদের আবির্ভাব-এর পর উপাসনার ভিত্তিতে কেউ মুসলমান, কেউ খ্রীষ্টান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ জৈন—কিন্তু এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই হিন্দু। যেমন, এখানে নানাবিধ রাজনৈতিক দল আছে—বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ইত্যাদি। কিন্তু প্রত্যেক সদস্যই ভারতীয় (Indian), অর্থাৎ ভারত ভূখণ্ডে বসবাসকারী সমস্ত নাগরিকই ভারতীয় তথা হিন্দু; এই দেশ হিন্দুস্তান বা হিন্দুস্থান—এখানে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

হিন্দুধর্ম সনাতন, শাশ্বত, অপৌরুষেয়। এর সৃষ্টি যেমন নেই, তেমনই বিনাশও নেই। এ ধর্ম আছে, থাকবে, অনন্তকাল থাকবে। এষো ধর্মো সনাতনঃ। সনাতন, শ্বাশত ইত্যাদি বিশেষণবাচক পদ। আমাদের ভারতবাসীর একটি ধর্ম আছে, সেটি হিন্দুধর্ম। সিন্ধুপারের জনগণের সংস্কৃতি এবং সাধনায় পরিপুষ্ট এই মহান এবং পবিত্র ধর্ম। খুব সাধারণভাবে বলা যায়, যাঁরা ভারতবর্ষের চিরন্তন সংস্কৃতি এবং সুবিকশিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী, তাঁরাই প্রকৃত অর্থে হিন্দু। আরো একধাপ এগিয়ে আমরা একটি সহজ রসায়ন সামনে আনতে পারি এবং তা হচ্ছে—যিনি নিজেকে মনে-প্রাণে হিন্দু মনে করেন, তিনিই প্রকৃত হিন্দু, যেখানে ভেদাভেদের কোন প্রশ্নই নেই, কেবলমাত্র হিন্দু।

এবার আমি এই হিন্দুদের ওপর অবিরাম আক্রমণের হাত থেকে নিস্তার লাভের লক্ষ্যে কিছু মহান ব্যক্তিত্বের চিন্তন, নিরলস শ্রমদান এবং পরিষদ গঠনের বিষয়ে উল্লেখ কর।

'হিন্দুস্থান সমাচার' সংবাদ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দাদাসাহেব শিবরাম শঙ্কর আপ্তে। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিন্দুদের দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি চাক্ষুষ করেছিলেন। তাঁদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের ওপর আঘাত তাঁকে খুব মানসিক কষ্ট দিয়েছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন হিন্দু সমাজ এবং হিন্দুত্বকে যে কোন মূল্যে রক্ষা করা অতীব জরুরী। সময়টা ১৯৬০ সালের আগে-পরে। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক (RSS, 1925)-এর দ্বিতীয় সংসংঘচালক শ্রী মাধবরাও সদাশিব রাও গোলওয়ালকর (পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী হিসেবে যিনি সর্বজন পরিচিত)-কে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন। শ্রীগুরুজীও হিন্দুদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত ছিলেন এবং সঙ্গত কারণে সদাই

চিন্তিত ছিলেন।

এই সময় হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রী বি. জি. দেশপাণ্ডে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মুম্বই-এর সান্দীপনী সাধনালয়ের স্বামী চিন্ময়ানন্দ বিশ্বব্যাপী হিন্দুধর্মের প্রচার এবং প্রসার বিষয়ে নিত্য ব্যস্ত ছিলেন। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন ছিলেন।

উপরোক্ত মহাজনেরা সবাই যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সারা বিশ্বে হিন্দুদের ধর্ম-কৃষ্টি রক্ষা এবং হিন্দুত্বের অস্তিত্বের প্রশ্নে বিশ্বের হিন্দুদেরকে একই সূত্রে গ্রথিত করার জন্য প্রয়াসী হলেন।

মহীশূরের রাজা শ্রী জয় চামরাজ বাড়িযারজী সর্বান্তকরণে এই প্রয়াসে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। এই মহান উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এগিয়ে এলেন নানা মত, পথ এবং সম্প্রদায়ের সাধুসন্ত, বিদ্বজ্জন, চিন্তাবিদ্ এবং অনেক সমর্পিত প্রাণ।

অবশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অশেষ আশীর্বাদে ইং ১৯৬৪ সালের ২৯শে আগষ্ট শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে মুম্বাই-এ স্বামী চিন্ময়ানন্দজী মহারাজের 'সান্দীপনী সাধনালয়'-এ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুসন্ত এবং বিদ্বজ্জনের আন্তরিক সমর্থনে 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-এর শুভ প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম অধ্যক্ষ মহীশূরের মহামহিম মহারাজা জয় চামরাজজী, প্রথম সাধারণ সম্পাদক শ্রী দাদাসাহেব আপ্তে।

পরিষদের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

১। বিশ্বের সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে একাত্মতা সৃষ্টি করা, হিন্দুধর্মকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা।

২। হিন্দুদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন।

৩। অস্পৃশ্যতা রদ এবং সমরসতা আনয়ন। অস্পৃশ্যতা, জাত-পাত ভেদ নিবারণের মাধ্যমে প্রতিটি হিন্দুকে যথার্থ সম্মান প্রদান এবং সমাজকল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। আমাদের মহামন্ত্র ঃ

হিন্দবঃ সোদরাঃ সর্বে ন হিন্দুঃ পতিতো ভবেৎ।
মম দীক্ষা হিন্দুরক্ষা মম মন্ত্রঃ সমানতা।।

(সকল হিন্দু সহোদর ভাই-বোনের মতো, কোনো হিন্দুই পতিত বা উপেক্ষিত নয়। হিন্দুদের রক্ষার প্রয়োজনেই আমার দীক্ষা, আমার মন্ত্র সমানতা।)

এভাবেই এ মন্ত্রে দীক্ষিত হিন্দুসমাজ লাঞ্ছিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দুদেরকে কাছে টানতে সক্ষম হবে এবং সারা বিশ্বের গোটা হিন্দু সমাজ স্বাভিমানের জীবন্ত মন্ত্রে জাগ্রত হবে। তখন মন্ত্রটির সংক্ষিপ্ত রূপ হবে—'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে।' ফলস্বরূপ, পৃথিবীর সমস্ত হিন্দুদের মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার একটি পবিত্র বন্ধনের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে।

৪। শুদ্ধিপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরাবর্তন।

আজ আমাদের সবারই উপলব্ধি হওয়া দরকার যে, আমরা সবাই ভারত মাতার সন্তান, আমরা যেন সবাই সহোদর ভাই-বোন। বহির্ভারতে যত হিন্দু আছেন তাঁরাও আমাদের আপনার জন। ভারতমাতাতেই আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্ম। আমরা অবশ্যই ব্যাপক অর্থে পৃথ্বীমাতার সন্তান এবং এই বিচারে আমাদের অনেক কর্তব্যকর্মও আছে।

প্রথমত, আমাদের সবাইকে যথার্থ হিন্দু হতে হবে, হিন্দু মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। অনুশাসনের মাধ্যমে সমরসতা তথা সাম্যভাব হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়, ত্যাগ আসে। আবার, ত্যাগের মাধ্যমেই হয় প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ। ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগের প্রদীপ্ত মহিমার কথাই বলেছে।

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।

ত্যাগীর সমাজ বিশ্বকে বরণ করতে পারে, জগতের হিত করতে পারে, কল্যাণ এবং সুখপ্রদান করতে পারে।

'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়'।

হিন্দুগৃহীর পঞ্চমাতার পূজা-অর্চনাদি করা আবশ্যক। (ক) দেশমাতৃকা, (খ) গর্ভধারিণী মাতা, (গ) গোমাতা, (ঘ) গঙ্গামাতা এবং (ঙ) তুলসীমাতা।

হিন্দুগণ কিছু আন্দোলনাত্মক কার্যাদিও করবেন। প্রশিক্ষিত এবং সমর্পিত অধিকারীগণ এ বিষয়ে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে প্রণিধানযোগ্যগুলি—

(১) শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির নির্মাণ,
(২) রামসেতু রক্ষা,
(৩) গো-সংরক্ষণ এবং সংবর্ধন,
(৪) সামাজিক সমরসতা,
(৫) মন্দির অধিগ্রহণ ইত্যাদি।

পরিষদের গঠনমূলক নানা আয়াম (বিভাগ)-কে শক্তিশালী করার জন্য বিশেষভাবে সবাইকে উদ্যোগী হতে

হবে। সেবা-কার্যাদির সম্প্রসারণ করতে হবে। এ সমস্ত বিষয়ে আমাদেরকে মানসিকভাবে তৈরি হতে হবে, শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, তন-মন-ধন সমর্পণ করতে হবে। এ সবের মাধ্যমে আমরা 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'কে একটি শক্তিশালী সামাজিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবো এবং তখনই হিন্দুধর্ম ভারতীয় সার্বভৌম ধর্মের যথার্থ মর্যাদা লাভ করবে।

নিত্যকর্ম হিসেবে প্রতিটি হিন্দু নিম্নলিখিত আচরণাদি করলে সুখকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

(১) প্রতিদিন সূর্যপ্রণাম, সম্ভব হলে সূর্যার্ঘ্য দান।

(২) সর্বত্র ওঁ-কার-এর ব্যবহার। সম্ভব হলে গলায় ওঁ চিহ্নযুক্ত বা ওঁ-কার বিশিষ্ট ধাতব পদার্থ মালার প্রান্তে ব্যবহার করা। টেলিফোন বা মোবাইলে 'হরিঃ ওঁ, জয় শ্রীরাম, হরে কৃষ্ণ, জয় ঠাকুর, জয় গুরু' ইত্যাদি বলে কল রিসিভ করা। 'হ্যালো' কদাপি নয়।

(৩) প্রতি বাড়িতে শ্রীমদ্ভাগবতগীতা এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ রাখা এবং নিত্য পাঠ করা, অন্তত ১টি শ্লোক। দেয়ালে পিতামাতা, পূর্বপুরুষ, ইষ্টদেবতা, গুরুদেব, ঠাকুর দেবতার ফটো সুন্দরভাবে টাঙিয়ে রাখা দরকার। সম্ভব হলে অবশ্যই ঠাকুর ঘরের ব্যবস্থা করা এবং নিত্য যথাসময়ে সেবাদি করা।

(৪) বাড়িতে তুলসীবেদী রাখা, স্নানের পর জল দেওয়া এবং প্রণাম করা।

(৫) সৎসঙ্গ, হরিসভা, মন্দির এবং অন্যান্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গমনাগমন, প্রার্থনা এবং ধর্মালোচনায় অংশগ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

(৬) সন্তান-সন্ততির জন্মদিনে তাদেরকে আসনে বসিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে ধান-দূর্বা-আতপচাল-ফুল-চন্দন সহযোগে আশীর্বাদ করা বাঞ্ছনীয়। এই সঙ্গে উলুধ্বনি এবং মঙ্গলশঙ্খ বাজানো আবশ্যক। এরপর বাড়িতে তৈরি পায়েশ, লুচি-তরকারি, বেগুন-আলু ভাজা, দই-মিষ্টি সাধ্যমতো সন্তানকে পরিবেশন করতে হবে। সবশেষে, সন্তান প্রণাম করবে, গুরুজন মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করবেন।

ইংরেজ কৃষ্টি 'কেক কাটা' এবং 'Happy Birthday to you' পরিহার করা সমীচিন।

(৭) সন্তান-সন্ততিকে মহান বাণী এবং আচরণবিধি-র সাথে পরিচিত করা দরকার।

পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব, দরিদ্রদেবো ভব ইত্যাদি। পিতা-মাতা, আচার্য, গুরুজনকে Hi/Hellow-এর পরিবর্তে প্রণাম/নমস্কার ইত্যাদি শেখানো দরকার।

(৮) খাওয়ার সময়, শোবার সময় বা অবসর সময়ে সন্তান-সন্ততির কাছে ঠাকুর-দেবতা, বেদ-পুরাণাদি, ইতিহাস, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু না কিছু গল্পচ্ছলে শেখানো যেতে পারে।

(৯) দশবিধ সংস্কার ভক্তি এবং নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা দরকার। পূজাপাঠ যেন শুধুমাত্র উৎসবে পরিণত না হয়—সেদিকে যত্নবান হতে হবে।

(১০) অতিথি সৎকারের শুভ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। 'অতিথিঃ নারায়ণঃ স্বয়ম্'।

(১১) বাড়িতে 'গোমাতা' সেবার ব্যবস্থা করতে পারলে খুবই ভালো হয়। গোমাতার দুগ্ধের তুলনা নেই। এইসঙ্গে প্রাণীর সেবা করাটাও জরুরী।

(১২) সবাইকে ভালবাসতে হবে, সবার কল্যাণ প্রার্থনা করতে হবে। কেউ পর নয়।

'অয়ং নিজঃ পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার-চরিতানাম্ তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।'

(১৩) মুখে হাসির রেখা অম্লান রাখা চাই। অন্যের মুখেও হাসি ফোটাতে সচেষ্ট হতে হবে।

(১৪) স্বামীজীর মহান শিক্ষা—

'জীবে প্রেম করে যেইজন,
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

আমাদের সব কাজে যথার্থভাবে প্রয়োগ হোক।

(১৫) স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করে আমরা যেন প্রকারান্তরে দেশমাতৃকাকে সেবা করতে পারি।

(১৬) Ta Ta-এর পরিবর্তে আমরা সহজেই বলতে পারি—দুর্গা, দুর্গা (দুগ্গা-দুগ্গা), রাম-রাম, জয়শ্রীরাম, কৃষ্ণ-কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্দুঃখভাগ্‌ভবেৎ।। ❑

বাংলার ধ্বংস হওয়া মন্দির

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

বুদ্ধিজীবীদের একটি বড় অংশ আত্মা-বিক্রি করে খোরপোষ পান। তাঁরা তারস্বরে বলে যাচ্ছেন বাবরি মসজিদ ভাঙা ঠিক হয়নি। ওখানে রাম মন্দির গড়ার দরকার নেই। গোঁ ধরেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, প্রগতিশীল অভারতীয় দাম্ভিক ক্যাম্পাসের আজাদিপন্থী মাতব্বররা। এ বিষয়ে বিতর্কের আর কোনো অবকাশ নেই। মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত বিচার করছেন, আলোচনার মাধ্যমে বা বিচারের সিদ্ধান্ত মেনে নেবার কথা চলছে। কিন্তু রামজন্মভূমি তো কোটি কোটি ভারতবাসীর বিশ্বাস ও ভক্তির ব্যাপার। একে বিচার ব্যবস্থায় আনা উচিত কি না এ প্রশ্ন তুলব না। আজ বলব, যদি ওই চত্বরে মসজিদের জন্য জমি দেওয়া হয়, তাহলে ভারতব্যাপী মুসলিম শাসক-গাজী-ধর্মান্ধরা যত মন্দির বিহার মঠ আশ্রম দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে তৈরি করেছে মসজিদ-খানকা- ঈদগাহ্-মিনার—সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠবেই।

ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম। বাংলার শত শত মন্দির বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে কত মসজিদ-খানকা-দরগা গড়া হয়েছে—তার একটা ছোট্ট বিবরণ দিলেই হিন্দু সমাজ শিউরে উঠবে। যদি বলি, বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে যারা মসজিদ রাখার কথা বলছেন, তারা কি বাংলার এইসব মন্দির-মঠ-আশ্রম-বিহার ফিরিয়ে দেবেন? বাংলার বিদীর্ণ বুদ্ধিজীবীদের কাছে কিছু আশা করি না, বাংলার আত্ম-মর্যাদাসম্পন্ন তরুণদের মধ্য থেকে স্থানীয়ভাবে আন্দোলন গড়ে উঠুক। এবার কিছু বিবরণ দিই। আরেকটা কথা, আমার প্রদত্ত উদাহরণগুলির উৎস মুসলমানদের রচনা। তারা নিজেই এসব ভাঙার কথা, মসজিদ আদি গড়ে তোলার আনন্দ প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ এতে যার শিল তার নোড়া তাকেই আক্কেল দাঁতের টনক নড়াবার ব্যবস্থা হতে পারে। হয় তারা স্বীকার করুক, 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র প্রমাণ রেখে এসব ফেরৎ দিক। নতুবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রশ্নগুলি চাপা দেওয়া যাবে না।

S. A. A. Rizvi-র 'A History of Sufism in India' (নতুন দিল্লী ১৯৭৮)-এ আছে শেখ শিহাবুদ্দিন সুহরাবর্দি (১১৪৫-১২৩৫ খৃঃ)-র শিষ্য শেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি (৫৩৩-৬২৩ হিজরি) এসে পাণ্ডুয়ার কাছে দেবতলায় একটি বিশাল মন্দির ও কূপ (a large temple and a well) ধ্বংস করেন, সেইখানে তৈরি হত, তাঁর আসন (takiya বা Khangah)—আসপাশের হিন্দুদের জোর করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন তাব্রিজি। (উক্ত গ্রন্থ, ২০১-০২ পৃ.)। 'মৌয়াস্তা খাবুই-ই-তারিখ' (অনুবাদ George S. A. Ranking)-এ আছে ইখতিয়ার উদ-দিন-মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি (১২০২-১২০৬ খৃ. নদীয়া আক্রমণ করেন। লখনৌতি দখল করেন—রাজা লক্ষ্মণ সেন ('রায়লখমিয়া') চলে যান। বখতিয়ার সেইখানে সমস্ত মন্দির-মূর্তি ধ্বংস করেন ('destroyed the places of worship and idol temples') তৈরি হয় মসজিদ। সেখানে শোনা যায় 'আল্লা হো আকবর' (ওই ; প্রথম খণ্ড, পাটনা, ১৯৭৩-৮২-৮৩ পৃ.)।

'মাসির-ই-আলমগিরি' (যদুনাথ সরকার অনুবাদিত; কলকাতা, ১৯৪৭)-এর তৃতীয় খণ্ডে আছে আওরংজেবের একটি আদেশনামা। তাঁর পদবি-উপাধিটি বেশ বড়—'মুহিউদ্দিন মুহম্মদ আউরংজেব আলমগির পাতশাহ গাজী' (১৬৫৮-১৭০৭ খৃ.)। আদেশনামাতে বলা হচ্ছে, কটক থেকে মেদিনীপুর—যেখানে যত মন্দির আছে সব ভেঙে ফেলতে হবে। মেদিনীপুরের তিলকুটি নামের গ্রামে সদ্য গড়া মন্দিরটি ভাঙতে হবে—বাংলা-উড়িষ্যা সীমান্তের সব মন্দির-ই এইভাবে ভাঙতে হবে—'The destruction of all temples built any where in the province.' গড়তে হবে মসজিদ। তারপর প্রতিবেদন পাঠাতে হবে দিল্লী দরবারে; ধ্বংসকারী ধর্মযোদ্ধা এই প্রতিবেদনে সই করবেন, ওপরে পড়বে রাজকীয় মোহর (the seal of Gazi)। তাহলে এটা নিশ্চয় বলা যায় এই অঞ্চলের যাবতীয় মসজিদ-খানকা-তাকিয়া-মসনদ-দরবার সবই হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে গড়া হয়েছে। (ওই : ১৮৮-৮৯ পৃ.)।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ ড. সয়ীদ মহম্মদুল হাসান লিখেছেন 'Mosque Architecture of Pre-Mugal Bengal' (ঢাকা, ১৯৭৯

খৃ.)। সেখানে এরকম প্রচুর উদাহরণ আছে। ড. হাসানের মতে বাংলার প্রাক-মুঘল মসজিদ ও অন্যান্য মুসলিম স্থাপত্য বাংলার হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত। (ওই, ২২৮ পৃ.)। আদিনা মসজিদ-এ পাওয়া গেছে—গোরু ও বাছুরের মূর্তি, হংস মূর্তি, ভগ্ন-মনুষ্য মূর্তি, মকরবাহিনী গঙ্গা ও ভগীরথ মূর্তি (লর্ড কানিংহাম বলেছিলেন 'a man and woman on a cocodile')। আদিনা মসজিদের নানা মহলের দরজা একান্তভাবেই হিন্দু স্থাপত্যের পরিচয় বহন করছে। ড. হাসান বলছেন, এ হল 'Hindu door frames' আর তা 'rarely found in Indian Mosques' (ওই. ২৩৭ পৃ.)।

আদিনা মসজিদ আদতে যে হিন্দু মন্দির তা স্পষ্ট হয় এখানে রাখা প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের শিলালিপিতে। এখানে আছে ব্রহ্মা ও সরস্বতী দেবীর নাম। (ওই, ২৩৭ পৃ.)। পাশাপাশি আদিনা মসজিদ-এর আয়তন দেখে কেউ কেউ বিবেচনা করেছেন, এটি বৌদ্ধস্তূপ ছিল। বৌদ্ধ স্তূপগুলিতে হিন্দু দেবমূর্তি থাকা অসম্ভব নয়। এ দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই প্রস্থানই দীর্ঘদিন একসঙ্গে চলেছে। বিতর্ক ছিল দর্শনে ও সাধন-পথে, কিন্তু কেউ কাউকে উৎখাত করেনি।

এরকম অজস্র তথ্য আছে। ক্রমে সেসব প্রকাশ করব। এবার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়ে লেখাটি শেষ করছি।

১. বাঁকুড়া : বেণুগোপাল মন্দির ভেঙে হয়েছে গাজি ইসমাইলের মাজার।

২. বর্ধমান : ইণ্ডলাবাদের মন্দির ভেঙে হয়েছে মসজিদ গড়া হয় ১৭০৩ খৃ. নাগাদ।

৩. বর্ধমান, কালনা : মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে শাহ মজলিস, ১৪৯১-৯৩ খৃ.।

৪. বর্ধমান, কালনা : মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছ শাহি মসজিদ, ১৫৩৩ খৃ.।

৫. বর্ধমান, মঙ্গলকোট : মন্দির ভেঙে গড়া হয় জামি মসজিদ ১৫২০-১৫২৩ খৃ.।

৬. বর্ধমান, সৌতা : বৌদ্ধ বিহার ভেঙে গড়া হয় দরগা সৈ. শহিদ মহম্মদ বাহমনী।

৭. বর্ধমান, সৌতা : বৌদ্ধ বিহার ভেঙে মসজিদ গড়া হয় ১৫০২ খৃ.।

৮. কলকাতা, বেনিয়াপুকুর : মন্দির ভেঙে তৈরি হয় আলাউদ্দিন আলাউল হক-এর মসজিদ ১৩৪২ খৃ.।

৯. হুগলী, ত্রিবেণী : মন্দির ভেঙে গড়া হয়েছে জাফর খান কি মসজিদ, ১২৯৮ খৃ.।

১০. হুগলী, ত্রিবেণী : মন্দির ভেঙে মসজিদ হয় ১৪৫৯ খৃ.।

১১. মালদহ, গৌড় : মন্দির ভেঙে তাঁতিপাড়া মসজিদ হয় ১৪৮০ খৃ.।

১২. মালদহ, গৌড় : মন্দির ভেঙে গড়ে উঠে লাটন মসজিদ, ১৪৭৩ খৃ.।

১৩. মালদহ, গৌড় : মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপ ভেঙে গড়া হয় বড় সোনা মসজিদ ১৫২৬ খৃ.।

১৪. মালদহ গৌড় : হিন্দু মন্দির ভেঙে দরগা মখদুর আলি শিরাজ চিস্তি (নিজামুদ্দিন আউলিয়া-র) গড়া হয় ১৩৪৭ খৃ.।

১৫. ওই, ওই : হিন্দু মন্দির ভেঙে গড়া হয় চমনকান্তি মসজিদ ১৪৫৯ খৃ.।

১৬. ওই, ওই : হিন্দু মন্দির ভেঙে তৈরি হয় জামি মসজিদ ১৫৬৬ খৃ.।

১৭. ওই, ওই : হিন্দু মন্দির ভেঙে গড়া হয় দাক মোহন মসজিদ ১৪২৭ খৃ.।

১৮. মালদহ, পাণ্ডুয়া : হিন্দু মন্দির বা বৌদ্ধ স্তূপ ভেঙে গড়া হয় আদিনা মসজিদ, ১৩৬৮ খৃ.।

১৯. ওই, ওই : হিন্দু মন্দির ভেঙে গড়া হয় 'ছে হাজারি দরগা মূর কুতব-ই-আলম', ১৪১৫ খৃ.।

২০. ওই, ওই : হিন্দু মন্দির ভেঙে গড়া হয় 'বাইসা হাজারি, খানকা জালালউদ্দিন তাব্রিজি' ১২৪৪ খৃ.।

২১. মেদিনীপুর : গগণেশ্বর শিব মন্দির ভেঙে গড়া হয় করমবেড়া গড় মসজিদ, ১৫০৯ খৃ.।

২২. মেদিনীপুর, কেশিয়ারি : মহাদেব মন্দির ভেঙে গড়া হয় মসজিদ, ১৬২২ খৃ.।

আপাতত শুধু তারিখ ও নামযুক্ত মন্দিরের উল্লেখ করলাম। এমন অজস্র আছে। পূর্ণাঙ্গ সন্ধান করলে কয়েক হাজার হবে। ভবিষ্যতের গবেষকের উপর সেই দাবি রেখে যাচ্ছি। অধুনা বাংলাদেশ ধরলে এই তালিকা ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।

এখন যদি দাবি ওঠে এগুলি হিন্দু-বৌদ্ধদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, কি বলবেন ছদ্ম ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী বিচিত্রকর্মী বুদ্ধিজীবী ও কদর্য রাজনীতিবিদরা! উত্তর কিন্তু দিতেই হবে। ❑

জাগো হিন্দু জাগো

বারিদবরণ বিশ্বাস

জাগো হিন্দু জাগো। তোমরা তোমাদের শত্রুকে চেনো। আর তোমাদের মধ্যে নিহিত সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত কর। তোমরা আর ঘুমিয়ে থেকো না। তোমরা চেতনশীল হও। তোমরা অহিংস, তোমরা সহনশীল। কিন্তু হিংসাকে প্রতিহত করতে তোমাদের যতটা সহিংস হওয়া উচিত, অন্তত ততখানি হও। অহিংসা পরমধর্ম, প্রেমই জগতের পরম বস্তু। পরমত সহিষ্ণুতাও হিন্দু ধর্মেরই অঙ্গ। কিন্তু পরমত সহিষ্ণুতা যেন কখনই অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে দুর্বলতার জায়গা না হয়ে ওঠে। কোনও ধর্ম কখনোই ছোট নয়। কিন্তু ধর্ম প্রবর্তকদের আসার অব্যবহিত পর থেকে ক্রমেই ধর্মের গ্লানি হতে থাকে। তাই ধর্মের গ্লানি দূর না হলে সে ধর্ম এক সময় অধর্মে পর্যবসিত হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে অধর্মের নাগপাশে প্রকৃত ধর্ম লাঞ্ছিত হতে থাকে। হিন্দু ধর্মের মধ্যেও যখনই গ্লানি এসেছে, তখনই মহামানব হয়ে অবতার পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ তেমনই অবতার পুরুষ, যাঁরা ধর্মকে গ্লানিমুক্ত করতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও করেছেন। দেশ এবং জাতিকে কলুষমুক্ত করতে এবং অধার্মিক হিংসাশ্রয়ী শয়তানরূপী ত্রাস সৃষ্টিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হিন্দু জনসমাজকে তাই জাগতেই হবে।

কেউ কেউ হয়তো ভ্রূ কুচকে বলবেন, শুধু হিন্দুদেরই কেন জাগতে হবে? গোটা ভারতবাসীদের নয় কেন? আমি বলব, হিন্দুস্থানে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই তো হিন্দু। আজ হয়তো তারা নানা ধর্মাবলম্বী। অতীতে বহিরাগতদের চাপে কিংবা জীবনরক্ষার্থে তারা অন্যধর্ম অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এটা তো ঠিক, এই দেশে বসবাসকারী সমস্ত মানুষই একসময় ছিল হিন্দু। কারণ সিন্ধু তীরবর্তী সব মানুষই পরিচিত ছিল হিন্দু নামে। শুদ্ধাচারী ঋষিদের প্রবর্তিত সংস্কার ছড়িয়ে পড়েছিল আসমুদ্র হিমাচল। হিন্দু ধর্ম ঋষিপ্রদত্ত সেই বৈদিক সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সংস্কারকে আমরা আজও বংশপরম্পরায় পালন করে চলেছি। কিন্তু বহিরাগত শক্তির দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়েছে এই সংস্কার এবং এই সংস্কার পালনকারী মানুষেরাও।

আজও এই সংস্কার এবং এই সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষরা বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত। তাই আমাদের আজ এই শুভ আর্য সংস্কারকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। জাগ্রত চেতনায় এই শুভ সংস্কারকে আত্মস্থ করতে হবে এবং তাকে প্রচারে এবং প্রসারে যত্নবান হতে হবে। এই শুভ সংস্কারকে রক্ষা এবং তার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কলিযুগেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর, অনুকূলচন্দ্র প্রমুখ সচেষ্ট হয়েছেন। ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র তো তাঁর বাণীতে বলছেন, ''আর্য কৃষ্টির যা ব্যাঘাত/খড়্গো তোরা কর নিপাত।'' সুতরাং আর্যকৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই যেন হয় আমাদের একমাত্র ব্রত। সমস্ত মহামানবরাই মানবতার জয়গান করে গেছেন। আর সনাতন হিন্দু ধর্মও সেই মানবতার কথাই বলে। ফলে হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় না তেমন মানবতার ধ্বংসকারী কোনও উগ্র সংগঠনকে। প্রকৃত হিন্দু মনোভাবাপন্ন কোনও ব্যক্তিই ধ্বংসাত্মক মনোভাবাপন্ন হতে পারেন না। কারণ কোনও হিন্দু শাস্ত্রেই নেই যে বিধর্মীদের বিনাশ কর। বরং এই ধর্ম বলছে, ''সর্বে ভবন্তু সুখীনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।'' হিন্দু ধর্মই বলে সবার ভাল হোক।

কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু ধর্ম সম্প্রদায় আছে, যারা শুধু তাদের প্রচার এবং প্রসার চায় এবং এর জন্য জীবনহানি করার বিধানও দেয়। এর জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে এক সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। সবসময় আমাদের একটা ভয়, ''এখনই কিছু একটা হয়ে যাবে না তো? প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারব তো? তার সাথে সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার পালনের ক্ষেত্রেও সম্মুখীন হতে হচ্ছে নানারকম বাধা বিপত্তির। যেমন কিছুদিন আগেও হাওড়ার একটি স্কুলে সরস্বতী পুজো করতে পারেনি হিন্দু ছাত্রছাত্রীরা। অনেক স্থানে প্রতিমা ভেঙেচুরে দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবাংলার অনেক জেলায় প্রকাশ্যে ঢোল কিংবা ডঙ্কা বাজাতে পারছে না হিন্দুরা। গৃহবধুরা ফ্ল্যাটে শঙ্খ বাজাতে গেলে বিধিনিষেধের সম্মুখীন হচ্ছেন।

অথচ আমাদেরই একদল হিন্দু সতীর্থ ভাইরা যাঁরা

নিজেদের হিন্দু মনে করেন না, যাঁরা শুধু নামে হিন্দু এবং দুর্গা ঠাকুর, কালী ঠাকুরের পুজোর প্যান্ডেল উদ্বোধন করে থাকেন—তারা হিন্দুত্ব নিয়ে বেজায় খাপ্পা থাকেন। গৈরিক রং তাদের একেবারে না-পসন্দ। কিন্তু এই হতভাগ্যরা ভুলে যান—আমাদের জাতীয় পতাকার শীর্ষে থাকে গৈরিক রং। নীচে সবুজ, মাঝখানে সাদা। সুতরাং গৈরিক বর্ণকে অবজ্ঞা করা মানে যে প্রকারন্তরে জাতীয় পতাকাকে অবমাননা করা, তা বোঝেন না।

তাঁরা ২৪ ঘণ্টা হিন্দুত্বকে গালিগালাজ করেন অথচ হিন্দুদের ভোটে জিতে মন্ত্রী সাংসদ হন এবং সংসদকে হাটবাজারের সমতুল্য করে তোলেন সভ্যতা ভব্যতাকে বিসর্জন দিয়ে।

এঁরা বোঝেন না, হিন্দুত্ব হিন্দুদের বিশ্বাস। মনেপ্রাণে যদি হিন্দুত্ব না থাকে, তাহলে তাকে কি হিন্দু বলা যায়? যাঁরা রাতদিন হিন্দুত্বকে গালাগাল দিয়ে মঞ্চ কাঁপাচ্ছেন, তাঁদের একবার জিজ্ঞাসা করুন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে কি চান—দেশ থেকে হিন্দুত্ব চলে যাক? তাহলে তাই যদি হয়, তবে তো দেশ থেকে মঠ মন্দির ঠাকুরমশাইদের সব বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে হবে। সমস্ত হিন্দুত্ববাদে বিশ্বাসী মানুষদেও সেই সঙ্গে হারিয়ে যেতে হবে অন্ধকারে।

বর্তমানে যে অবস্থা আমাদের রাজ্য এবং দেশে চলছে তা হল হিন্দুত্ব বনাম অন্যান্য জোটশক্তি। অর্থাৎ অহিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক শক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এদেশে প্রায় আশি শতাংশেরও বেশি জনগণ হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও এদেশে হিন্দুত্ব বিরোধী শক্তি খুবই সক্রিয়। যার ফলে হিন্দুস্থানে পুনরায় সুলতানী এবং মোঘলযুগ ফিরিয়ে এনে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছেন ঘরশত্রু বিভীষণরা। বিভীষণ তবুও অধর্মের বিরুদ্ধে পুরষোত্তমের পক্ষে ছিল, কিন্তু এই বিভীষণরা নিজেদের স্বার্থে সন্ত্রাসীদের আমদানী করছেন যা যথার্থই আতঙ্কের।

আজ আমাদের আতঙ্কমুক্ত হওয়ার জন্য তাই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ত্রিশ শতাংশ ভোট নয়, ফ্যাক্টর হোক সত্তর শতাংশ হিন্দু ভোট। যারা হিন্দুত্বকে সম্মান করে, যারা হিন্দু বা আর্য সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা এবং অন্তরে বিশ্বাস করে, ভোট দেওয়া উচিত তাদের। যারা হিন্দুত্বের অবমাননা করে হিন্দুদের চরম লাঞ্ছনা এবং বঞ্চনার বিভীষিকা হয়ে উঠছে—তাদের আপনারা জানুন, চিনুন এবং তারা আপনাদের যথার্থ সম্মান দেখাক এই প্রত্যাশা পূরণে যত্নবান হোন।

আজ পশ্চিমবঙ্গে একটি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতারা কোনও একটি দলকে রাজ্যে ক্ষমতায় আনার জন্য বুক ফুলিয়ে নিজেদের কৃতিত্ব দাবী করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মত সাংবিধানিক পদে আসীন মহান সম্মানিত ব্যক্তি সম্পর্কেও রীতিমত অকথা কুকথা বলে চলেছেন—যা রীতিমত চিন্তার বিষয়। জানি ভারতে বসবাসকারী ওই সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ ওরকম মনোভাবাপন্ন নন। অনেকেই আছেন যাঁরা মার্জিত চিন্তা ও চেতনার অধিকারী। কিন্তু সেই নগণ্য সংখ্যক মানুষ ওই বিপুল সংখ্যক হিংসাশ্রয়ী মানুষকে কিভাবে ধরে রাখবে? অতীতে খান আব্দুল গফ্ফর খান বা সীমান্ত গান্ধী কি পেরেছিলেন ভারত ভাগ আটকাতে? মহামান্য এ পি জে আব্দুল কালাম (প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি) ভারতকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পারেননি কাশ্মীরকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে, কিংবা মুম্বাই বিস্ফোরণকে আটকাতে। তাই জাগো হিন্দু জাগো। দেশকে রাহুমুক্ত করতে শক্তিশালী হয়ে ওঠো। নিরীহ অসহায়ের প্রতি অকারণ আক্রমণ নয়। কিন্তু দেশের স্বার্থ, দশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন। ঋষি বঙ্কিমের দেশ-মাতাকে পবিত্র রাখতে শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের মত আত্মবলিদানে তৎপর হতেই হবে। হিন্দুদের সঙ্গে সঙ্গে অহিন্দুদেরও সামিল করতে হবে। বৌদ্ধ শিখ জৈন এবং দেশমাতৃকার ভক্ত এমন মুসলিমদেরকেও দেশ সেবায় আকৃষ্ট করতে হবে। তবে সার্বিকভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সুরক্ষিত রাখার কাজ করতে হবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদেরকেই। আর এ কাজ করতে হলে প্রথমেই হিন্দুত্ববিরোধী শক্তিকে নির্মূল করতে হবে। কারণ হিন্দুত্ব এদেশের রক্তে, এদেশের লসিকায়। আবহমানকাল ধরে চলে আসা এদেশের সংস্কৃতি হল হিন্দুত্ব। ভগবান বুদ্ধ দশাবতারের একজন। তাই বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্বকালে হিন্দুদের উপর কোনও আঘাত আসেনি যা মুসলিম এবং খ্রীস্টান আগমনে হয়েছিল।

তাই নতুন ভারত নির্মাণে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে হিন্দুদের। রাজ্যে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে ক্ষমতাসীন কিছু রাজনৈতিক দল সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ককে

অটুট রাখতে এবং পশ্চিমাদুনিয়ার পেট্রোডলারের বিনিময়ে হিন্দুত্ব মুছে দিতে বদ্ধ-পরিকর। রাজ্য সরকার পোষিত স্কুলে সরস্বতী বন্দনা নিরুৎসাহিত। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত কিংবা যোগ ব্যায়াম অথবা রামায়ণ মহাভারতের পাঠসহ ইতিহাসে আর্যযুগের ইতিহাসও মুছে দিতে চাইছেন তাঁরা। পালবংশ এবং শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, রাজ্যবর্ধন ইত্যাদি রাজাদের কাহিনী মুছে দিতে চাইছেন। মুছে দিতে চাইছেন ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, নানকদের কথা। রাজ্য সরকার পোষিত স্কুলে গৈরিকীকরণ চলবে না। তাহলে রাজ্য সরকারের টাকায় মাদ্রাসাদতে কেন চলবে আরবী উর্দু ভাষায় শিক্ষা? সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার যদি হয় গৈরিকীকরণ, বেদ, উপনিষদ, গীতা সহ রামায়ণ, মহাভারত পাঠ যদি হয় গৈরিকীকরণ তাহলে সরকার কোরাণ হাদিস পড়াতে তৎপর হচ্ছেন কেন? অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে কথোপকথন ভিত্তিক পাঠ্যে চরিত্রের নামকরণে আনা হয়েছে ইসলামিক নাম। কই বাংলাদেশ পাকিস্তানে তো কোনো হিন্দু নাম নেই।

তাহলে কি আমরা ধরে নেব অদূর ভবিষ্যতেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে? ১৯৬৪ সাল থকে বাঙালী হিন্দুরা একবার দেশ ত্যাগ করেছেন—আপনারা কি আরও একবার বাস্তুচ্যুত হতে চাইছেন? যদি ধর্মান্তরিত হয়ে এ রাজ্যে থাকতে চান তো বহুত আচ্ছা, নইলে সাচ্চা হিন্দু হয়ে বাঁচতে চাইলে এখন থেকে লড়াই-এর জন্য তৈরী হোন নইলে শিয়রে শমন। ওই ক্ষমতালিপ্সু নেতারা যা খুশী করতে পারেন। তাঁদের কাছে গরু, ঘোড়া, শুকর ভেড়া খাওয়া সহ একসাথে চুম্বন ক্রিয়া করাটাও করা কোনও বিষয় নয়। তাঁরা আইন করে নিজেদের বেতন বাড়াতে পারেন। কিন্তু সরকারী কর্মচারীদের ডিএ দেওয়ার ব্যাপারে ৩৪ বছরের বাম জমানার ঋণের বোঝার মত অজুহাত খাড়া করতে কুণ্ঠিত নন। মেলা খেলা সহ বাম ডান নেতাদের পকেট ভরানো সহ গুণ্ডা মস্তান পোষার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় উৎসাহী। বন্ধু, আমাদের ক্ষতে নুন দেওয়ার অনেকেই আছে। কিন্তু উপশমকারী প্রলেপ দেওয়ার কেউই নেই।

তাই আসুন, আমরা পরস্পর পরস্পরের হাত ধরি। বহুমত ও পথে বিশ্বাসী হয়ে বিচ্ছিন্ন না থেকে একত্রে হিন্দুত্ববোধে সদা জাগ্রত থাকি। আমরাও যেন হয়ে উঠি আমাদের স্বার্থরক্ষাকারী রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাঙ্ক। আমাদের সবার গর্ব স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি হিন্দুত্বের অবমাননায় গর্জে উঠে বলেছিলেন—

পুতুল পূজা করে না হিন্দু
কাঠমাটি দিয়ে গড়া,
মৃন্ময় মাঝে চিন্ময় হেরে
হয়ে যাই আত্মহারা।

১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে সনাতন হিন্দু ধর্মের মহানুভবতা তুলে ধরেছিলেন। সেই সাথে সমস্ত হিন্দুদের সম্মানের আসনে বসিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ম ফেলনা নয়। সনাতন হিন্দুধর্মকে সার্বজনীন করে তুলতে তাই আসুন আমরা সমস্ত হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হই। সচেতন হই আমরা আমাদের অধিকারবোধে। আমাদের ভেটে জিতে আমাদের করের টাকায় মোচ্ছব করে আমাদের অবমাননা সহ্য না করার জন্য আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

মনে রাখতে হবে, হিন্দু এবং হিন্দুস্থান পরস্পর ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। আর সেই কারণে দ্বিধাবিভক্ত হিন্দুস্থানে হিন্দুরা আজ নিজভূমে পরবাসী। উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজা তুলে যেমন মানবতার অপমান নয়, তেমনি আত্মমর্যাদার বিসর্জন দিয়ে মস্তিষ্কের অপলাপ ঘটানোও কখনো কাম্য নয়। হিন্দুত্ব আমাদের সত্ত্বায়, হিন্দুত্ব আমাদের সংস্কারে। সেই হিন্দত্বের অপমানে আমাদের নীরব নিদ্রা আত্মহননের সমান নয় কি? ❑

With best compliments from :

ASHOK KUMAR CHATTERJEE

BARDHAMAN

ষষ্ঠী ও জামাই ষষ্ঠী

দেবপ্রসাদ মজুমদার

হিন্দুদের সমস্ত ধর্মানুষ্ঠান ও কৃত্যানুষ্ঠান তিথি বিচারে উদ্‌যাপিত হয়ে তাকে। তিথি বিচারে ষষ্ঠী নন্দা তিথি। নন্দা অর্থে আনন্দদায়িনী। তিথি দেবী ভগবতীর শক্তিস্বরূপা। এই তিথিকে আবার ষষ্ঠী দেবী রূপে কল্পনা করা হয়ে থাকে। অনেকে দেবী স্কন্দমাতাকে ষষ্ঠী বলে থাকেন। যাইহোক এই তিথির সঙ্গে দেবতা স্কন্দের সংযোগ পাওয়া যায়। চতুর্থী তিথিতে যেমন গণেশের প্রাধান্য বা গণেশের প্রিয় তিনি, তেমনি ষষ্ঠী কার্তিকেয়ের বা স্কন্দদেবের প্রিয় তিথি।

প্রতি মাসে দুই পক্ষে দুটি করে ষষ্ঠী তিথি আছে। একটি কৃষ্ণা ষষ্ঠী ও অপরটি শুক্লা ষষ্ঠী। ভারতধর্মে তিথির বিচারে কৃষ্ণা ষষ্ঠী অপেক্ষা শুক্লা ষষ্ঠীকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মীয় কৃত্যানুষ্ঠান ঐ শুক্লা ষষ্ঠীতেই উদযাপিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে প্রতিমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতেই এক একজন ষষ্ঠীদেবীর পূজা প্রচলিত আছে এবং ঐ বারো মাসে বারোটি ষষ্ঠী তিথিরও পৃথক পৃথক নাম পাওয়া যায়। যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে যে পুজো হয় তাকে বলা হয় ধূলা ষষ্ঠী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে যে দেবী পূজিতা হন তিনি অরণ্য ষষ্ঠী। বাংলাদেশ তথা পূর্বভারতে ঐ ষষ্ঠী জামাই ষষ্ঠী নামে পরিচিত। আষাঢ়ের শুক্লা ষষ্ঠীকে বলা হয় কোড়াষষ্ঠী, শ্রাবণের শুক্লা ষষ্ঠী লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রের শুক্লা ষষ্ঠী মন্দন ষষ্ঠী, আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠী দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকের শুক্লা ষষ্ঠী গোষ্ঠ ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী মূলা ষষ্ঠী, পৌষের শুক্লা ষষ্ঠী পাটাই ষষ্ঠী, মাঘের শুক্লা ষষ্ঠী শীতল ষষ্ঠী, এটা সরস্বতী পূজার পরের দিন অনুষ্ঠিত হয় ও এদিন গোটা সেদ্ধ খাওয়ার রীতি আছে। ফাল্গুনের শুক্লা ষষ্ঠীকে অশোক ষষ্ঠী এবং চৈত্রের শুক্লা ষষ্ঠীকে বলে নীল ষষ্ঠী।

আমাদের দেশে পূজা-অর্চনা, ধর্মাচরণ, দেব আরাধনা সেবাপূজা ও তার আয়োজন ইত্যাদি প্রধানতঃ পুরুষদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু ষষ্ঠী পুজা বাংলাদেশ তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের দ্বারা করানোর রীতি প্রচলিত আছে। ষষ্ঠীদেবীর এই যে পূজা তা বহু বিচিত্র প্রতীকে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রী হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর—হিন্দু দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থে এই বিষয়ে খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন—ষষ্ঠী দেবীর প্রতীক ও বিচিত্র, মশলা বাটা শিল-নোড়া (ইনি মাঘ মাসে শীতলা ষষ্ঠীর দিনে পূজিতা হন), বট বা অশ্বত্থ বৃন্তমূলে গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড সমূহ, বটের মাথা শাখা, কাষ্ঠ বা ধাতুনির্মিত মন্থন দণ্ড (এটা ভাদ্রমাসে মন্থন ষষ্ঠী) প্রভৃতি ষষ্ঠীদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজিত হন। বটবৃক্ষ ষষ্ঠীদেবীর প্রিয়। গোটা ফল ও জোড়া ফল ষষ্ঠী পূজায় প্রদান করবার রীতি। বালি, নৈবেদ্য, পান্তাভাত, সাদা বেগুন ও সাদা সীম সহ সবুজ কলাই সিদ্ধ, দধি ইত্যাদি শীতলা ষষ্ঠীর পূজার উপকরণ। মন্থন ষষ্ঠীর পূজা হয় পুকুর ঘাটে মন্থন দণ্ড স্থাপিত করে। অশোক ষষ্ঠীর পূজা হয় ফাল্গুন মাসে অশোক ফুলে। এই দিনে শোক রহিত হওয়ার কামনায় অশোক কুঁড়ি মেয়েরা বিশেষত মায়েরা ভক্ষণ কররে থাকেন। শীতলা ষষ্ঠীর সঙ্গে ওলাউঠার ও বসন্ত রোগের দেবতা শীতলার, অশোক ষষ্ঠীর সঙ্গে শোক রহিতা দুর্গা (নব পত্রিকার অন্যতম) এবং দুর্গা ষষ্ঠীর সঙ্গে দুর্গা মহিষমর্দিনীর সংশ্রিণ ঘটেছে।

যেহেতু দেবী দুর্গা সর্বদেবময়ী এবং আশ্বিনে দুর্গাপুজার প্রারম্ভে ষষ্ঠী পূজার রীতি আছে তাই ষষ্ঠীর সঙ্গে দেবী দুর্গার সংযোগ থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু ষষ্ঠীদেবী প্রস্তর (শিল, নোড়া বা গোলাকৃতি প্রস্তরে) প্রতীকে পূজিতা হন তাই পূর্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। বৈদিক যজ্ঞের তথা অগ্নির সঙ্গে অশ্বত্থবৃক্ষের সম্পর্ক আছে। আবার বট অশ্বত্থ বৃক্ষের বিকল্প। তাই যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ষষ্ঠী দেবীর সম্পর্ক আছে ধরে নেওয়া যায়। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মী উত্থিতা হয়েছিলেন। মন্থন ষষ্ঠীপূজা সমুদ্র মন্থনে উত্থিতা লক্ষ্মীর পূজা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া গ্রামেগঞ্জে প্রস্তর নির্মিত মনসা মূর্তিতে ষষ্ঠীদেবীর পূজা হয়ে তাকে। তাই ষষ্ঠীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ককেও অস্বীকার করা যায় না। এটা বলেছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস গ্রন্থে। এছাড়াও শিশু জন্মালে জন্মের ষষ্ঠী রাত্রিতে প্রসবাগারে সূতিকা ষষ্ঠীর পূজা করা হয়। এছাড়া শিশু জন্মানোর একুশ দিনে বা ত্রিশ দিনের মাথায় ষষ্ঠী পূজার রীতি আছে।

দেবী ষষ্ঠীর উৎপত্তি ও আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু কাহিনী বিদ্যমান। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী ''স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা তপস্যায় নিরত থাকতেন। একদিন ব্রহ্মা এঁকে সন্তান লাভের জন্য বিবাহ করতে বলেন। ব্রহ্মার আদেশে ইনি বিবাহ করলেও বহুকাল পর্যন্ত এঁর কোন সন্তান হলো না। তখন ইনি কশ্যপ ঋষির সাহায্যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন। রাজার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে মৃত পুত্র প্রসব করলেন। এই মৃত পুত্রকে নিয়ে রাজা শ্মশানে গেলে এক উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করে সেখানে

এক দেবী এলেন। তিনি রাজার সমস্ত কথা শুনে বললেন, আমি ব্রহ্মার মানস কন্যা, আমার নাম দেবসেনা, মাতৃকার মধ্যে আমি প্রধানা, কার্তিকেয় আমার স্বামী। আমি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা, সৈইজন্য আমার নাম ষষ্ঠী। তপস্যা দ্বারা এই মৃত পুত্রকে পুনর্জীবিত করে দেবী সঙ্গে নিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা তখন এই দৃশ্য দেখে দেবীর স্তব করতে লাগলেন। স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী বললেন, তুমি আমার পূজার অনুষ্ঠান করলে এই পুত্রকে আমি প্রত্যর্পণ করব। রাজা স্বীকৃত হয়ে ষষ্ঠীর পূজা করলেন। শিশুর জন্ম হতে ৬ষ্ঠ দিনে ও একুশ দিনে সন্তানের কল্যাণের জন্য এই পূজা প্রচলিত হল। স্কন্দপুরাণে এবং মহাভারতেও ষষ্ঠীদেবীর কাহিনী অবশ্যই অন্যভাবে বিদ্যমান।

ষষ্ঠীদেবীর উদ্ভবের প্রাচীনতা নিয়েও নানান বিতর্ক বিদ্যমান। কোন কোন পণ্ডিত ষষ্ঠীদেবীকে লৌকিক দেবী বলে উল্লেখ করলেও কারও কারও মতে তিনি বৈদিক বা পৌরাণিক দেবী। কোন কোন পণ্ডিত ষষ্ঠীকে অনার্যদেবী রূপে বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ বলেন বৌদ্ধ মহাষষ্ঠীদের দেবী হারীতীই হিন্দুদের দেবী ষষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে ষষ্ঠী অনার্য দেবতা নন। মহাভারতের রুদ্রশিব বা অগ্নিপুত্র স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনাই যে ষষ্ঠীদেবী তার বহুল তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক ষড়হ মাগের সঙ্গে স্কন্দ বা কার্ত্তিকেয় এবং স্কন্দপত্নী দেবসেনা ষষ্ঠী যে সংযুক্তা তারও উল্লেখ আছে। বৌধায়ণের ধর্মসূত্রে কার্ত্তিকেয়ের নামন্তর হিসাবে ষষ্ঠী নামটি উল্লিখিত। বৌধের মুদ্রাতেও (খ্রীঃ ২য় শতাব্দী) কার্তিকেয়ের সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠীদেবীর বিচরণ আছে। এই দুটি পুরাণকে পণ্ডিতেরা অর্বাচীন বলে গণ্য করলেও পুরাণ দুটি খৃষ্ঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে রচিত নয়। তবে ষষ্ঠীদেবীর কোনো কোনো প্রতীকে অনার্য প্রভাব থাকতেও পারে। এ তথ্য অমরা পাই শ্রী হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যের হিন্দু দেবদেবীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থ থেকে। তবে অগ্নি, স্কন্দ বা কার্তিকেয়ের সঙ্গে দেবসেনা বা ষষ্ঠীদেবী যে নানাভাবে সংযুক্ত তার বহুল প্রমাণ পুরাণে, মহাভারতে বিদ্যমান।

ষষ্ঠীদেবীর মহিমা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য আছে। সেখানে ষষ্ঠীদেবীর পূজা ব্রতকথা বা মহিমাসূচক উপাখ্যান বর্ণিত। বাংলাদেশের মেয়েরা, মায়েরা ও গৃহবধূরা মুখে মুখে ঐ পাঁচালী গান করে ষষ্ঠীদেবীর মঙ্গল গান গেয়ে থাকেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই তিনি শিশুদের রক্ষয়িত্রী ও পালয়িত্রী দেবী। সেই দেবী যে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনা বা ষষ্ঠী তা প্রায় আমরা ভুলেই বসেছি।

আবার আলোচনা করা যাক জামাই ষষ্ঠী সম্বন্ধে, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথি অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী নামে খ্যাত। অরণ্যষষ্ঠী দেবীর ধ্যান মন্ত্রে বলা হয়েছে—তিনি দ্বিভুজা, যুবতী, বর ও অভয়মুদ্রা ধারিনী, গৌরবর্ণা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দিব্যবস্ত্র পরিহিতা, বামক্রোড়েস্থিত পুত্র সহিতা, প্রসন্নবদনা, নিত্যা, জগদ্ধাত্রী, পুত্রদায়িনী, সর্বলক্ষণ-যুক্তা, স্থূল ও উন্নত পয়োধরা ষষ্ঠীদেবীকে বন্দনা করি। অরণ্য ষষ্ঠী পুজোতে বলা হয়েছে যে কুলস্ত্রীরা একহাতে একটা পাখা নিয়ে বসে যাবে এবং বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পুজো করবে। অরণ্যে গমন করে পুজো করতে হয় বলে এই ষষ্ঠীদেবীকে অরণ্যষষ্ঠীদেবী বলে। ষষ্ঠীদেবীর পুজোর প্রাচীনতা সম্বন্ধে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর ''হিন্দু দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ'' গ্রন্থে বলেছেন— ''ষষ্ঠীদেবীর পুজো সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু পূর্বে নয়। ষষ্ঠী পুজো প্রচারের জন্য কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। ষষ্ঠী পুজোর প্রচলন অবশ্যই আগে থেকে, ষষ্ঠীদেবীর প্রাচীন মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায়নি। শিশু আস্তিকক্রোড়া মনসামূর্তিকেই ষষ্ঠী বলে অনেক জায়গায় পুজো করা হয়। উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ষষ্ঠীদেবীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে দেবী বাম উরুতে একটি শিশুকে বসিয়ে বাঁ হাতে তাকে ধরে আছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন তাঁর তিথিতত্ত্ব জৈষ্ঠ্যমাসে, অগ্রহায়ণ মাসে ও চৈত্র মাসের শুক্ল-পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে ষষ্ঠী পুজোর বিধান দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী স্কন্দ ষষ্ঠীর পুজো নির্দিষ্ট। অরণ্যষষ্ঠীতে বিন্ধ্যবাসিনী ও ষষ্ঠী অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে যেমন ষষ্ঠীর ধ্যান আছে, রঘুনন্দনও তেমনি ষষ্ঠীপূজার বিবরণ দিয়েছেন। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ষষ্ঠীপুজোর প্রচলন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং দেবী ভাগবতে ষষ্ঠীপুজা মর্ত্যে প্রচলিত হওয়ার বিবরণ থেকে অনুমিত হয় যে এই সময়েই ষষ্ঠীপূজা প্রচলিত হয়েছে। এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

অরণ্যষষ্ঠীকে রাঢ়বঙ্গে জামাইষষ্ঠী বলে এবং এই জামাই ষষ্ঠী হিসাবে এই দিনটি উদযাপিত হয়ে থাকে। এই উপলক্ষ্যে ঘরে ঘরে জামাইদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাদের উত্তম খাদ্যবস্তু দিয়ে আপ্যায়িত করবার প্রথা আছে। শ্বশুর শাশুড়ী পিতৃমাতৃতুল্য এবং জামাতা পুত্রতুল্য, সেইজন্য বিবাহিতা কন্যা ও জামাতাকে আশীর্বাদ দান ও কল্যাণের জন্য এই ব্রতের উদ্‌যাপন করা হয়। তবে বর্তমানে এই ব্রত ও কৃত্যানুষ্ঠানটি আচার সর্বস্ব বিলাস উৎসবে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে না আছে আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, ভক্তিভাব বা ভগবত বিশ্বাস। এটি একটা গতানুগতিক যান্ত্রিক উৎসবে পরিণত।❑

প রি ষ দ বা র্তা

ধর্মতলায় হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মসভা

গত ১১ই এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর পুণ্য তিথিতে কলকাতার ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এক ধর্মসভা আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের আন্তর্জাতিক যুগ্ম সম্পাদক ড. সুরেন্দ্র জৈন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী গুরুপদানন্দজী ও মহামন্ডলেশ্বর পরমাত্মানন্দ ভৈরব গিরি। স্বাগত ভাষণ দেন ড. কুশল কুন্ডু। স্বামী গুরুপদানন্দজী দেশ ও সমাজ রক্ষায় হিন্দু রক্ষী দলের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেন। পরমাত্মানন্দ ভৈরব গিরি মহারাজ রামনবমীতে সশস্ত্র শোভাযাত্রা করার অপরাধে রাজ্য সরকার যেভাবে পুলিশী হয়রানি চালাচ্ছে তার নিন্দে করেন। ড. সুরেন্দ্র জৈন বলেন সারা ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গও গৈরিক যুগে প্রবেশ করেছে। এরাজ্যে পরিবর্তন হওয়া অত্যন্ত দরকার। নাহলে রাজ্যটি দেশবিরোধী কর্মকান্ডের আখড়া হয়েই থেকে যাবে। তিনি আরও বলেন, বাংলার মাটির এক বিশেষত্ব রয়েছে। বাঙালীরা যে কাজ শুরু করেন, তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়েন না। মুসলিমদের তিন তালাক প্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন, এটি সমাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। ২০১৮ থেকে অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির জন্য পুনরায় করসেবা শুরু হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। কলকাতা মহানগর ও আশেপাশের জেলা থেকে বহু মানুষ এসে ধর্মসভায় যোগ দেন। মঞ্চ সঞ্চালনা করেন শ্রীমতী গার্গী মিত্র। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি অমরচাঁদ কুন্ডু, প্রান্ত সম্পাদক চিন্ময় দত্তসহ প্রান্ত ও মহানগর স্তরের বিশিষ্ট কার্যকর্তারা ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন।

বহরমপুরে ধর্মপ্রসার আয়ামের প্রান্তীয় অভ্যাস বর্গ

গত ২৯শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত বহরমপুরের ভারতমাতা মন্দিরে ধর্মপ্রসার বিভাগের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তীয় অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হয়। এই অভ্যাসবর্গে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ৯টি জেলা থেকে ৬৭ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। অভ্যাসবর্গে ধর্মপ্রসার বিভাগের পূর্বোত্তর ক্ষেত্র প্রমুখ অচ্যুতানন্দ কর, প্রান্ত সাধারণ সম্পাদক ডা. চিন্ময় দত্ত, প্রান্ত সম্পাদক ড. কুশল কুণ্ডু প্রমুখ বিশিষ্ট কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দু'জোড়া দম্পতিকে এই কার্যক্রমের মাঝে সাংস্কৃতিক দীক্ষা দেওয়া হয়। অভ্যাসবর্গের যাবতীয় ব্যবস্থা করেন গণেশ দাস ও প্রান্ত ধর্মপ্রসার প্রমুখ দেবাশীস চট্টোপাধ্যায়।

ফুলেশ্বর শ্রীদুর্গা সেবাশ্রমের তিন দিনের জলসত্র ও স্বাস্থ্য শিবির

গত ১৩ই এপ্রিল থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত মৌবেশিয়া কালীতলা প্রাঙ্গনে ১লা বৈশাখ ও নীলষষ্ঠী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ কর্তৃক এক জলসত্র ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এগুলিতে প্রায় ১১০০ জন পুণ্যার্থী সেবা গ্রহণ করেন। কার্যক্রম পরিচালনা করেন হাওড়া জেলার সেবা বিভাগের কার্যকতা ড. মানস মাইতি, নিমাই সাঁপুই ও সনৎ বেরা। হাওড়া জেলা সেবা প্রমুখ শ্যামাপ্রসাদ মণ্ডল, বেলা দলুই, বাবলু দাস, অসীমা খাঁড়া, সোমা ঘোড়ুই, অভীক হালদার, সোমনাথ মণ্ডল প্রমুখ কার্যকর্তার নিরলস পরিশ্রমে এই জলসত্র ও স্বাস্থ্য শিবিরের কার্যক্রমটি সুসম্পন্ন হয়।

দমদমে মাওবাদী হামলায় নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করল বজরং দল

গত ৭ই মে দমদম হনুমান মন্দিরের বিপরীতে ছত্রিশগড়ে মাওবাদী হামলায় নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। নিহত জওয়ানদের চিত্র জাতীয় পতাকা, মালা ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন অর্ঘ্য গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু রায় ও অন্যান্যরা। সভার পরে কার্যকর্তাদের সঙ্গে এসে মিলিত হন শমীক ভট্টাচার্য। হিন্দুত্ববাদী এই নেতাকে পাশে পেয়ে, তাঁর সান্নিধ্য লাভ করে উৎসাহিত হন প্রখণ্ড সদস্যরা। প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, নিতাই দাস প্রমুখ কার্যকর্তারা কার্যক্রমটিকে সফল করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

কলকাতায় গো-রক্ষা আয়ামের দু'দিনের অভ্যাস বর্গ

গত ২২-২৩শে এপ্রিল কলকাতার কেষ্টপুরে গো-রক্ষা আয়ামের দু'দিনের অভ্যাসবর্গ সম্পন্ন হল। ২২ তারিখ সন্ধ্যে ৬টার সময় গোরক্ষা আয়ামের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক ক্ষেমচাঁদ শর্মা বর্গের সূচনা করেন। বর্গে দক্ষিণ বঙ্গ প্রান্তের ৩৫জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক ত্রিলোকী নাথ বাগী, প্রান্ত সম্পাদক অঞ্জন কুমার বিশ্বাস, অধিবক্তা অলোক পাল, স্বামী আগমানন্দ প্রমুখ বর্গে উপস্থিত থেকে মার্গদর্শন দেন। অভ্যাসবর্গে ভারতীয় গো বংশের উৎপত্তি, ভারতীয় গো বংশ ও জাতির মধ্যে পার্থক্য, গো আধারিত জৈব কৃষি, বিভিন্ন প্রকার জৈব সার তৈরি, কীট নিয়ন্ত্রক ও কীট নাশকের অসুবিধে, পঞ্চগব্য-জড়িবুটি ইত্যাদি সহযোগে জীবনদায়ী ঔষধ, গো-বিজ্ঞান পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা হয়।

শোকসংবাদ

পরলোকে রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

গত ১২ই মার্চ যাদবপুরে নিজ বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন বিশিষ্ট লেখক, অধ্যাপক ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রাক্তন সহ সভাপতি ড. রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭০। স্পষ্টভাষী, খোলামেলা স্বভাবের ও নির্ভিক রাধেশ্যামবাবু 'ইসলামী ধর্মতত্ত্ব এবার ঘরে ফেরার পালা', 'মিথ্যার আবরণে দিল্লী-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রি', 'ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত', 'হিন্দু কালগণনা পদ্ধতি' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। বিশ্ব হিন্দু বার্তায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ওনার আকস্মিক প্রয়াণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকর্তারা শোকস্তব্ধ। ওনার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

পরলোকে প্রীতিমাধব রায়

গত ১৩ই এপ্রিল নিজ বাসবভনে প্রয়াত হলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ড. প্রীতিমাধব রায়। প্রীতিমাধববাবু ছিলেন একজন সুসংগঠক, সুলেখক, কর্মযোগী মানুষ। পরম শ্রদ্ধেয় দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রেরণায় তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজে যুক্ত হন। ১৯৯২-এ করসেবার জন্য বহু তরুণকে তিনি উৎসাহিত করে অযোধ্যায় পাঠান। বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর পরিষদের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হলে তিনি গুপ্তভাবে কাজ করে যান। বিশ্ব হিন্দু বার্তায় তিনি নিয়মিতভাবে লেখা প্রকাশ করবার জন্য দিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন WBCS আধিকারিক। প্রথম জীবনে রেলে চাকরি করার পর তিনি প্রাইভেটে সসম্মানে ইতিহাসে M.A. পাশ করেন ও অতঃপর গবেষণা করেন। এরপর WBCS-এর চাকরি পান। দু'বছর তিনি Bose Institute-এর Registrar-এর কাজ করেন। পরবর্তীকালে ফুড কমিশনার হন। তিনি 'হিন্দু রাষ্ট্র ভাবনা, শ্রীরামপুরের গুণীজন, ধর্মময় ভারত ও কর্মযোগী সতীশচন্দ্র ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন। ওনার প্রয়াণে শোকাহত পরিবারবর্গকে বিশ্ব হিন্দু বার্তার পক্ষ থেকে জানাই গভীর সমবেদনা।

রা জ্য বা র্তা

রামনবমী উপলক্ষ্যে অস্ত্র নিয়ে মিছিলে পুলিশি হয়রানি

গত রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তীতে যেভাবে রাজ্যের সর্বত্র বড় বড় মিছিল বেরিয়েছে তাতে নড়ে চড়ে বসেছে মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলি। এতকাল মুসলমানেরা মহরম পর্বে যথেচ্ছ অস্ত্রশস্ত্রের প্রদর্শন করে

হিন্দুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখত। এবার উল্টোটা হওয়ায়, অর্থাৎ হিন্দুরা অস্ত্র হাতে মিছিলে হাঁটায় আত্মতুষ্টি উবে গেছে হিন্দু বিরোধীদের। অতএব তাদের চাপে রাজ্য সরকারও নেমে পড়েছে ময়দানে। বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র মিছিলে হাঁটা মানুষজনের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার এড়াতে ঘরছাড়া রয়েছেন বহু কার্যকর্তা। ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধেও করা হয়েছে মামলা। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে মিছিল বাংলার সংস্কৃতি নয়। অথচ এ রাজ্যেই মুসলমানেরা অস্ত্র নিয়ে মহরমের তাজিয়া বের করে থাকে। এমন তাজিয়া থেকে রাজ্যের বহু স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে এ বছর। 'কৃপান' বা তরবারি শিখেদের ধর্মের অঙ্গ। অতএব তরবারি নিয়ে শোভাযাত্রা করতে আইনতঃ বাধা নেই তাদেরও। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দুরা অস্ত্র হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রা করে থাকেন। এ নিয়ে কারো কোনো আপত্তি হয়নি কখনও। কেবলমাত্র হিন্দু বাঙালীর ক্ষেত্রেই এটি নিয়ে ঘোর আপত্তি উঠছে মুসলিম ভোটভিক্ষু রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে। প্রকাশ্যে তরবারি প্রদর্শন করলে অস্ত্র আইনে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক সাত বছরের কারাদন্ড হতে পারে এমন মামলা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের এমন বৈষম্যমূলক আচরণে হিন্দুদের বিরাট অংশ ক্ষুব্ধ। স্তম্ভিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরাও। তরবারি নিয়ে ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবের সামনে মঙ্গলারতি করা তাঁদের চিরকালীন ঐতিহ্য।

মমতার 'হিন্দুত্ব' নিয়ে ধন্ধে সাধারণ মানুষ

বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে ইসলাম অনুসারে সরকার ও প্রশাসন চালিয়ে সারা দেশে 'হিন্দু বিরোধী' বলে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মাথায় হিজাব পরা ও গোহত্যায় সমর্থনকারী একজন নারীকে হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু কৃষ্টির প্রতি আদৌ শ্রদ্ধাশীল বলা যায় কি না, সেই প্রশ্ন উঁকি মেরেছে ওড়িশাবাসীরও মনে।

সম্প্রতি নারদাকাণ্ডে জেলবন্দী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পুরী গিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সমস্যা হয় তিনি পুরীর মন্দিরে পুজো দিতে গেলে। পুরীর মন্দিরে কোনো অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। মমতা যে যথার্থই হিন্দু, তা জোর গলায় না বললে তাঁকে পুজো করতে বাধা দেন মন্দিরের সেবাইত। চাপে পড়ে নিজেকে 'হিন্দু' বলতে বাধ্য হন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। অতঃপর তাঁকে পুজোর অনুমতি দেওয়া হয়। গ্রেপ্তার করা হয় মন্দিরের ঐ প্রতিবাদী সেবাইতকে। ভদ্রকের ঘটনার পর মমতার সফর নিয়ে চিন্তায় ছিলেন অনেকেই। সভা করলে তা আটকানোর কথা ভেবেছিল বজরং দল। গত ৩রা মে মালদা সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জন্য নির্দিষ্ট সরকারি নিবাসের (গৌড়ভবন) কাছেই একটি মন্দিরে নামকীর্তনের পালা বসেছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথমে লাউডস্পীকার খুলে নিতে ও পরে কীর্তন বন্ধ করতে বলা হয়। আয়োজক ও ভক্তবৃন্দেরা রুখে দাঁড়ান। কিছু মাইক খুলে নিলেও কীর্তন বন্ধ করা হয়নি। এই ঘটনার পরেই তড়িঘড়ি মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনিই খাঁটি হিন্দু। হিন্দু মেয়ে হয়েও তিনি যাবেন মসজিদে দোয়া চাইতে। স্বভাবতঃই মমতার এবম্বিধ হিন্দুত্বে বিস্মিত অনেকেই।

বীরভূমের সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর মিছিলে পুলিশের লাঠি চার্জ

গত ১১ই এপ্রিল বীরভূমের সিউড়িতে হনুমান জয়ন্তীর শোভাযাত্রায় যথেচ্ছ লাঠিচার্জ করে পুলিশ। মিছিলের উদ্যোক্তারা আগেই পুলিশের থেকে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু আইন শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এরপর উদ্যোক্তারা বিনা অনুমতিতেই শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র মিছিল করবেন বলে স্থির করেন। সেইমত সিউড়ির ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সামনে হনুমান জয়ন্তীর দিন বহু মানুষ জড়ো হন। পুলিশও তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যথাসময়ে মিছিল শুরু হয়ে বাস স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছোতেই যথেচ্ছ লাঠিপেটা করা শুরু হয় নিরস্ত্র জনতাকে। নামানো হয় র‍্যাফ। উদ্যোক্তাদের দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে লেকটাউনে শ্রীরামনবমী উদ্‌যাপনের অনুমতি দেয়নি স্থানীয় পুরসভা। উদ্যোক্তারা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে পুরসভাকে অনুমতি দিতে বাধ্য করে আদালত।

ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের পথ অবরোধ বাসন্তীতে

ফেসবুকে নবী মহম্মদ সম্পর্কিত একটি পোস্ট শেয়ার করায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী। 'মানিক' নামের ঐ যুবকের শাস্তি চেয়ে গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার সকাল থেকে বাসন্তী ব্রীজ থেকে চৌমাথা পর্য্যন্ত ব্যস্ততম সড়কটি অবরোধ করে রাখে মুসলমানেরা। অবরোধকারী জনতারা সমবেত কণ্ঠে 'ফাঁসী চাই', 'পোস্ট শেয়ারকারীর রক্ত চাই', 'মুন্ডু চাই', 'আল্লাহ্ হো আকবর', 'নারায়ে তাকবীর' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। দফায় দফায় অবরোধ করা হয় থানা। মুসলমানদের চাপে ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয় পুলিশ। আদালতের নির্দেশে তার ৭ দিনের জেল হেফাজত হয়েছে। ঘটনার কোনো বিবরণ কোনো সংবাদপত্র প্রকাশ না করে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিলেও এত বড় ঘটনা খবরের কাগজে না আসায় স্তম্ভিত এলাকাবাসীরা। মত প্রকাশের স্বাধীনতা এভাবে খর্ব করার ঘটনার প্রতিবাদ করতে দেখা মেলেনি কোনো আনন্দ পুরস্কার বিজেতার।

শিক্ষার ইসলামীকরণ নিয়ে সেমিনার কলকাতায়

গত ২৮শে এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে বঙ্গীয় নবউন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় জনবিন্যাসের পরিবর্তন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব।' পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য রাজনীতির চালিকাশক্তিরূপে উঠে এসেছে সংগঠিত মুসলিম ভোটব্যাঙ্ক। মুসলমানের সমর্থন ও হিন্দুদের একাংশের সমর্থন নিয়ে ৪১ বছর ধরে চলছে বাম ও তৃণমূল সরকার। অতএব ইসলামিক লবীর প্রভাব পড়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষাতেও। বর্তমানে এটি অত্যন্ত প্রকট হয়ে ধরা পড়ছে। 'রাম' শব্দে আপত্তি বলে বাংলাদেশের ঢঙে 'রামধনুর' নাম বদলে করা হয়েছে 'রঙধনু'। তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পরিবার পরিচিতি করাতে গিয়ে বাবা মা কাকা পিসীর পাশাপাশি স্থান পেয়েছে আব্বু-আম্মি, খালা, ফুফু। মাদ্রাসাগুলিতে জেহাদী তত্ত্বের প্রচারের পাশাপাশি সঙ্ঘ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি উঠিয়ে দেওয়ার হুমকী দেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত বিষয় সবিস্তারে আলোচিত হয় সেমিনারে। বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত কার্যবাহ ড. জিষ্ণু বসু ও টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। সরকার পোষিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামোর চূড়ান্ত অভাব ও ভাষা মাধ্যমগত বৈষম্যের বিষয়গুলি বক্তাদের আলোচনায় উঠে আসে। যোগেশচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক পঙ্কজ রায়, বঙ্গবাসী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক দেবাশিস চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। সেমিনারে সংস্কার ভারতীর পক্ষ থেকে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

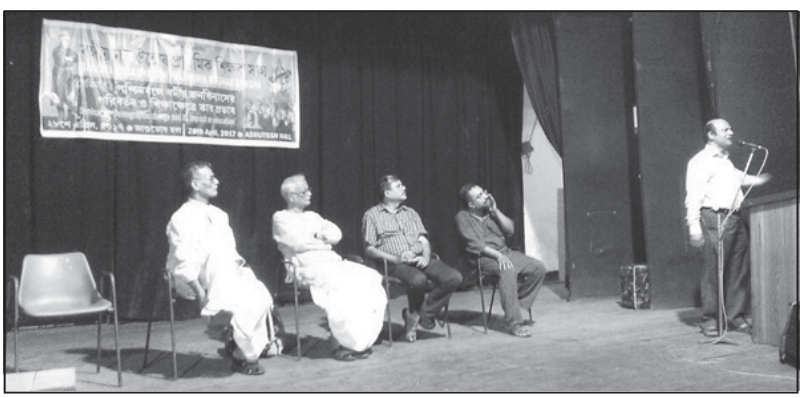

মেটিয়াবুরুজের কাছে রবীন্দ্রনগরে কৃষ্ণ ও কালীমন্দিরে গোমাংস : প্রতিবাদে হিন্দুরা

গত ২৬শে এপ্রিল সকালবেলায় মেটিয়াবুরুজ লাগোয়া রবীন্দ্রনগরের দুটি মন্দিরে প্লাস্টিকের ব্যাগ ভর্তি গোমাংস পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় হিন্দুরা। মহেশতলা পুরসভার ৬নং ওয়ার্ডের হরিসভা কৃষ্ণমন্দিরে এবং ৭নং ওয়ার্ডের রবীন্দ্রনগর হাইস্কুলের কাছে কালীমন্দিরে গোমাংস পড়ে থাকতে দেখা যায় এদিন।

এই ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মহেশতলার ৬নং ওয়ার্ডের খানাকুলি মোড়ে এদিন সকাল ৮টা থেকে

সকাল ১০টা পর্যন্ত পথ অবরোধ করেন স্থানীয় মানুষ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

বদলে যাওয়া জনবিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানের অত্যাচার বেড়ে চলেছে সন্দেশখালিতে

তেভাগা আন্দোলনখ্যাত সন্দেশখালি জায়গাটি প্রকৃতপক্ষে একটি ব-দ্বীপ। এর মাত্র ৩০ শতাংশ ভূমি স্থলভাগের সঙ্গে সংলগ্ন ও বাকি ৭০ শতাংশ সামুদ্রিক খাঁড়ি বেষ্টিত। মূলতঃ তপশীলি জাতি উপজাতি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে দেশী ও বাংলাদেশী মুসলমানের অত্যাচারে মানুষ গ্রাম ছেড়ে পালাচ্ছেন। এলাকায় অনুপ্রবেশ বরাবরই চলে এসেছে। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা সংখ্যায় প্রচুর, তাদের হাতে প্রচুর নগদ টাকা যা দিয়ে তারা এলাকার ভাল বসতজমি, দোকানঘরগুলি কিনে নিয়েছে। বাংলাদেশী মুসলিমদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য-চোরাচালান-অস্ত্রপাচার ইত্যাদি করে ফুলে ফেঁপে উঠেছে সীমান্তের এপারের মুসলমানেরাও। মুসলমানের ঘরে অনেকগুলি করে সন্তান। অতএব তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে টিকতে পারছেন না এক সন্তানবিশিষ্ট নিরুপদ্রব সুস্থ জীবন যাপনে বিশ্বাসী হিন্দু পরিবারগুলি। প্রতিদিন তাদের জমি-বাড়ি বেচে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রলোভন ও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাতে কাজ না হলে মারধর, কটূক্তি, অশ্রাব্য গালিগালাজ, সম্পত্তির অনিষ্ট, মান-সম্মান নষ্ট, বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানি ইত্যাদি কোনো অস্ত্র প্রয়োগেই মুসলমানেরা পিছপা নয়। কৃষিজমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে দিয়ে কৃষকদেরকে ভিটে ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। মুসলমানেরা বঙ্গ রাজনীতির নিয়ামক, অতএব তাদের সমস্ত জোর জুলুম দেখেও না দেখার ভান করে থাকে পুলিশ-প্রশাসন-রাজনৈতিক দলগুলি। মুসলিম যুবকেরা এলাকায় গড়ে তুলেছে বাইক বাহিনী। মোটরবাইকে করে এলাকায় টহল দিয়ে বেড়ায় সশস্ত্র যুবকেরা। তাদের কাজ হল শাসক দলের বিরুদ্ধে যাবতীয় কণ্ঠকে রুদ্ধ করা। সন্দেশখালিতে খোলা বাজারে বিক্রি হয় বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র।

সম্প্রতি সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত সুন্দরখালী গ্রামের রাজবাড়ী বাজারে একদল যুবক লতিকা নস্কর নামে এক কাওরা জাতির গৃহবধূকে অপমানজনক উক্তি করে। প্রতিবাদ করলে মহিলাকে তারা রাস্তায় ফেলে পেটায়। অর্ধনগ্ন ও অচৈতন্য অবস্থায় ঐ মহিলা আধ ঘণ্টারও বেশি রাস্তায় পড়ে থাকেন। এগিয়ে এসে সাহায্য করার সাহস হয়নি কারো। আধ ঘণ্টা পরে খবর পেয়ে মহিলার স্বামী ও আত্মীয়রা এলে তাদেরকে রিভলভার দেখিয়ে শাসানো হয়।

এই সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইরূপে শান্তিপূর্ণ পথ অবরোধ ও স্মারকলিপি দেওয়ার পথ বেছে নেন হিন্দু গ্রামবাসীরা। কিন্তু প্রশাসনের সঙ্গে বার্তালাপ চলাকালেই তাদের উপরে লোহার রড় ও রিভলভার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানেরা। প্রায় শতাধিক নারীপুরুষ এর ফলে আহত হন। তাঁদের মধ্যে জনা কুড়িকে বসিরহাটে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, গুরুতর আহতদেরকে পাঠানো হয় কলকাতায়।

১লা মে দৈনিক যুগশঙ্খে সন্দেশখালির পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাদবাকি সংবাদমাধ্যম খরবটিকে ধামাচাপা দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বার্থে দায়িত্বজ্ঞানের (?!) পরিচয় দেয়। সুপরিকল্পিত ইসলামিক জেহাদের শিকার হলেও তা অনুধাবন করতে ব্যর্থ সন্দেশখালির হিন্দুরা। উৎপীড়নকারীদের ধর্মকে এ জন্য দায়ী করার বুদ্ধি আসেনি তাদের মাথায়। 'দুষ্কৃতির কোনো ধর্ম হয় না' এই বিশ্বাসই হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছেন তাঁরা। এলাকা হিন্দুশূন্য হওয়ার দিকে এগোচ্ছে।

রা ষ্ট্র বা র্তা

কাশ্মীরে সেনার উপরে আক্রমণ ও অঙ্গচ্ছেদের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

কাশ্মীরে দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপ ও দুই ভারতীয় সেনার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গত ১লা মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষদের মুখপাত্র বিনোদ বনসল জানান, এবার সময় হয়েছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে চরম পদক্ষেপ নেওয়ার। কাশ্মীরে যারা সেনাবাহিনীর উপরে পাথর ছুঁড়ছে তাদেরকে যেন সেনার

উপরে আক্রমণকারী ছাড়া আর কিছু ভাবা না হয়। এদের মোকাবিলায় সেনাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। কাশ্মীরে সেনার উপরে আক্রমণ ও অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে বজরঙ্গ দল শীঘ্র সারা দেশে বিক্ষোভ দেখাবে বলে জানান তিনি।

ত্রিপুরার আগরতলায় বজরং দলের সভা

এ বছর আগরতলার অদূরে চাম্পামুরায় বজরং দলের শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। শিবির শেষে বজরং দলের পক্ষ থেকে আগরতলার প্রাণকেন্দ্র রবীন্দ্রভবনের সামনে মঞ্চ গড়ে সভা করা হয়। সভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বজরং দলের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মনোজ বর্মা। মনোজ বর্মা তাঁর ভাষণে দেশমাতৃকার সেবায় ত্রিপুরার যুবকদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। গোমাতা-নদীমাতার রক্ষার কথা বলেন। কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করেন। উত্তর পূর্বাঞ্চলের সংগঠন সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে ত্রিপুরায় এসেছেন। ত্রিপুরাতেও ধর্মান্তরণের ঘটনা প্রতিদিন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্মত্যাগী যুবকেরা মূলতঃ দেশবিরোধী ক্রিয়াকলাপে জড়িয়ে পড়েন এ কথা পরীক্ষিত সত্য। ত্রিপুরায় বজরং দলের সংগঠন আরও দৃঢ় হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন।

মহামহিম রাষ্ট্রপতি — ২রা মে, ২০১৭
ভারত
জেলাশাসক মহোদয়
উপ জেলাশাসক মহোদয়

বিষয় : কাশ্মীরে পাথর ছোঁড়ার ষড়যন্ত্র ও তার সমর্থকদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্বন্ধে

মহোদয়,

জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর উপত্যকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের উপরে পাথর ছোঁড়ার ঘটনা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গতদিন যখন সেনাবাহিনী সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজে তল্লাশী চালাচ্ছিল, তখন স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে পাথর ছুঁড়ে মারে। শ্রীনগরের উপনির্বাচনের পর এই দুঃসাহস আরও বেড়ে গেছে। সেনা জওয়ানদের জিনিস কেড়ে নেওয়া, তাঁদেরকে লাথি ঘুষি মারা, তাঁদেরকে পেটানোর মত ঘটনা ঘটছে।

সেনা বা পুলিশ এদের বিরুদ্ধে কোনো বড় পদক্ষেপ নিতে গেলেই বহু মানবাধিকার সংগঠন এই অমানবিকদের সমর্থনে এগিয়ে আসে এবং পুলিশ বা সেনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে। এতে সেনার মনোবল ভেঙে যায়। রাষ্ট্রভক্ত নাগরিকের চেতনা ও মর্যাদায় আঘাত লাগে। এরা শুধুমাত্র পাথররাজই নয়, বরং সন্ত্রাসবাদী। ওদের প্রতি নরম মনোভাব এদের দুঃসাহস ও সংখ্যা দুইই বাড়িয়ে দেয়। যখনই কাশ্মীরে কোনো দুর্যোগ হয়েছে তখনই সেনা কাশ্মীরীদের পাশে দাঁড়িয়েছে, নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে বন্যায় বিপর্যস্ত মানুষদের বাঁচিয়েছে। ভারতীয় সেনা ভারতের জনগণমনের গৌরব। ভারতীয় সেনা দেশের মর্যাদার রক্ষক। ভারতীয় সেনা নিয়ে দেশের প্রতিটি নাগরিক গর্বিত। সেনার অপমান হলে দেশের মানুষ রুষ্ট হন।

সেনার অপমান এই দেশর নাগরিকদের অপমান। এজন্য এই পাথরবাজদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের ন্যায় ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা সেনাকে দেওয়া উচিত। যে সমস্ত মানবাধিকার সংগঠন এই পাথরবাজদেরকে সমর্থন করছে তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমনের আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে উপত্যকায় দেশদ্রোহীতা না জন্ম নেয়। এদের জন্য অমরনাথের তীর্থযাত্রাও ব্যাহত হয়। এমন ব্যবস্থা নেওয়া হোক, যাতে তীর্থযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে।

ধন্যবাদান্তে
বজরং দল

বি শ্ব বা র্তা

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে পিটিয়ে মারা হল সাংবাদিকতার ছাত্রকে

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের আবদুল ওয়ালি খান বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা নিয়ে পড়তেন তেইশ বছর বয়স্ক মশাল খান। গত বছর ডিসেম্বর মাস নাগাদ তিনি ফেসবুকে নিজের নামে একটি নকল প্রোফাইল দেখতে পান। ঐ প্রোফাইল থেকে অন্য একটি মেয়ের ফেক প্রোফাইলে কথা চালাচালি চলছিল। এতে বিপদ বুঝে মশাল তাঁর বন্ধুদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করেন।

কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে রটে যায় যে মশালের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ইসলামবিরোধী কথাবার্তা প্রচার করা হচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ক্রুদ্ধ হতে থাকে। গত ১৩ই এপ্রিল জনাদশেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেই মশালকে নগ্ন করিয়ে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে। মারের চোটে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে হাড় মাংস বেরিয়ে আসে মশালের। তাতেও শান্ত হয় না ঐ ধর্মোন্মাদ যুবকেরা। রিভলবার বের করে গুলি করে মেরে ফেলা হয় মশালকে। এরপর তার মৃতদেহটিকে লাঠি দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেকে এই বীভৎস ঘটনা চাক্ষুষ করলেও প্রতিবাদ করবার সাহস পাননি। কেউ কেউ অবশ্য ঘটনাটি মোবাইল ক্যামেরায় বন্দী করেন ও আপলোড করে দেন।

ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মশালের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ঘেঁটে তাতে ইসলামবিরোধী কিছু খুঁজে পায়নি। পাকিস্তানে ধর্মদ্রোহীতার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। ধর্মদ্রোহীতার দায়ে আইনতঃ দু'চার বছর জেল থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত কার্যকর করা হয়ে থাকে। এছাড়া বহু লোককে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে খুন করা হয়ে থাকে। ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে এমন ৬৫ জনকে মেরে ফেলার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

মশালের মৃত্যুর পরে তাঁর শেষকৃত্য করতে রাজি হননি স্থানীয় মৌলবী। পরে যিনি শেষকৃত্যের দায়িত্ব নেন, তাঁকে ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়।

বর্তমানে পাকিস্তানে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নিয়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রত্যেকে নিজেদের পেজে লিখে দিচ্ছেন যে, তারা নতুন কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খোলেননি। যদি কেউ তাঁদের ছবি দেওয়া প্রোফাইল থেকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় তবে যেন তা অ্যাকসেপ্ট না করা হয়।

যদিও এমন ঘটনায় পাকপ্রীতিতে ছেদ পড়েনি ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় যা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত প্রগতিশীল অতিবামেদের।

বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নববর্ষে গোমাংস পরিবেশন

গত ১লা বৈশাখ বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে না জানিয়ে হিন্দু ছাত্রদেরকে গোমাংস দিয়ে তৈরি খাদ্য পরিবেশন করা হয়। একথা জানাজানি হতে হিন্দু ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতিবছরের মতো এ বছরও বিশ্ববিদ্যালয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি চলছিল। ঠিক তার আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন থেকে পরিবেশিত খাদ্যে গোমাংস পাওয়া যায়। হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে গোমাংস নিষিদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন ঘটনা ঘটায় বিস্মিত সকলে। ঘটনার জেরে জাকির হুসেন নামে জনৈক ক্যান্টিনের কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। জাকির হুসেনের মতে সে বহুদিন ধরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। কিন্তু এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। এ বছর বাংলাদেশ ছাত্রলীগ নেতা সোহাগের নির্দেশে জোর করে তাকে গোমাংস দিয়ে 'তেহারী' বানাতে বলা হয়। তোলার টাকা না দিতে পারায় সোহাগের নির্দেশ মান্য করা ছাড়া গতি ছিল না জাকিরের।

মূল অভিযুক্ত 'সোহাগ' এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

পশ্চিমবঙ্গে রামনবমী ও হনুমান জয়ন্তী উদ্‌যাপনে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বজরং দলের বিক্ষোভ

কাশ্মীরে সেনার উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে শহীদ স্মরণ : ১. দমদম, ২. পুরুলিয়া, ৩. মালদা

পাকিস্তানে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে খুন করা হল মশাল খানকে

পূর্ব মেদিনীপুরে গণ ডেপুটেশন

VISHVA HINDU VARTA | 15th May, 2017 | Post Regd. No. KOLRMS/98/2016-18
Phone : 2555-3588/4231 | Price : Rs. 10 only | Regd. No. 30136/77

হনুমান জয়ন্তীর পুণ্য তিথিতে কলকাতার ধর্মতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মসভা

গ্রাহকের ঠিকানা

Website : www.vhp.org/Bengali ● E-mail : vishvahindu1964@gmail.com / vishvahinduvarta@yahoo.in
সম্পাদক ও প্রকাশক ঃ শ্রী পীতারুণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, কলকাতা-৪ হইতে প্রকাশিত
ও আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং, বি/১৫/১/এইচ/২, বলাই সিংহ লেন, কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।